

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া'র
মুখপত্র

বাতায়ন

এ কা দ শ স ং ক ল ন

রজব ১৪৪৫

মাঘ ১৪৩০

জানুয়ারি ২০২৪

বাতায়ন

একাদশ সংকলন

উপদেষ্টা	হযরত মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা.
তত্ত্বাবধায়ক	মা'হাদ পরিচালনা পরিষদ
সম্পাদক	মুফতী মাহমুদুল আমীন
নির্বাহী সম্পাদক	মুফতী হাফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহযোগী	মা'হাদ দারুত তাসনীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
অঙ্গসজ্জা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান
প্রকাশক	মা'হাদ প্রকাশনী
মূল্য	৳০.০০ (আশি) টাকা
প্রাপ্তিস্থান	মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া (আল-মদিনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স) প্লট-০২, রোড-০৮, ব্লক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েবসাইট	www.mahadbd.com

ই-মেইল mbuhus@gmail.com
মোবাইল ০১৯৬৭-৯৬৯৫৯০

রোজনামচার পাতা ১২৯

ভর্তি, সদস্য তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাবলী ১৩৭

সূ | চি | প | ত্র

সংখ্যা ১১, রজব ১৪৪৫, মাঘ ১৪৩০, জানুয়ারি ২০২৪

সম্পাদকীয়	০৫
ইসলাম ও কাদিয়ানিয়াত : দুটি আলাদা ধর্ম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী রহ.	০৯
জুমু'আর বয়ান : মুত্তাকীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মুফতী মাহমুদুল আমীন	২১
প্রফেসর হযরত রহ. যেমন ছিলেন মুহাম্মাদ আদম আলী	৩১
ফিলিস্তিন : অতীত থেকে বর্তমান মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল	৩৭
হাদীসের আলোকে প্রকৃত রোযা মুফতী হাফিজুর রহমান	৫৫
মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মাওলানা সাঈদুর রহমান	৫৯
মা'হাদের ইলমী সফর : দিগন্তের ডাকে... জুনাইদ আহমাদ শিবলী	৮৭
নিকট অতীতে যেসব বরণ্য আলেমকে হারালাম	১০৯
ফাতাওয়া মাসাইল	১১৪
মা'হাদ আঙিনা	১২১

বাতায়ন

একাদশ সংকলনটি

মাস ট্যুর এন্ড ট্রাভেল্‌স
হাজী গ্রুপ
অটো টেক
আবাহন ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড
নূর রাইয়ান এন্টারপ্রাইজ
-এর সৌজন্যে প্রকাশিত হলো।

mḡúv`Kxq

এক.

ফিলিস্তিন মজলুম এক মুসলিম জনপদ। খ্রিস্টশক্তির মদদপুষ্ট জায়নবাদী ইহুদিদের হিংস্র আত্মসনে ক্ষত-বিক্ষত এক দেশ। দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে যে জমিনে মুসলমানদের খুন ঝরেছে। মুসলমানদের নিজ ঘরবাড়ি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিশাল মুসলিম ভূখণ্ড ইহুদী আত্মসনে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকেও মুসলমানদের উচ্ছেদ করার জন্য নির্মম হত্যাজ্ঞা চালানো হচ্ছে। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে সুউচ্চ ভবনগুলো মুহূর্তেই ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। বোমার আঘাতে মুসলিম দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফুলের মত নিষ্পাপ হাজার হাজার শিশুর পবিত্র খুনে গাজার জমিন রক্তজবায় পরিণত হচ্ছে। এত শিশু হত্যা, অল্প একটু ভূমিতে এত বোমা নিক্ষেপ কে, কবে, কোথায় দেখেছে? শিক্ষালয়, হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, কোথায় বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে না?

ইতিহাসের ঘৃণ্য ও জঘন্যতম আত্মসন চালিয়ে ফিলিস্তিনকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে, অথচ আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছি। নিষ্পাপ শিশুর রক্তমাখা লাশ বুকে শোকাক্ত মায়ের কান্না, ভবনের নিচে আটকে পড়া সম্ভানের জন্য বাবার অসহায় ছোটোছুটি, স্বামী ও স্বজনহারা মুসলিম বোনের গগণবিদারী আতঁচিৎকার, কোনো কিছুই যেন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করছে না। শাহাদাতের পূর্বে ফিলিস্তিনী ছোট্ট শিশুর এই বার্তা ‘আমি আল্লাহর কাছে সব বলে দেব’ আমাদের ঈমানকে নাড়া দিচ্ছে না। পরিবারের ৩৫ জনকে হারিয়ে অসহায় মুসলিম বোনের ‘মদদ ইয়া উম্মাতাল ইসলাম মদদ’ বলে সাহায্যাকুতি মুসলিম শাসকদের ঘুম ভাঙাতে

পারছে না। কোন মুখ নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াবো। কীভাবে মুসলিম পরিচয় দেব? তিনি তো বলেছেন,

দয়া-মায়া, মহব্বত ও সহমর্মিতায় তুমি মুমিনগণকে একই দেহের মত পাবে, যখন কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন পুরো দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভেঙে পড়ে। -সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০১১

দুনিয়ার মোহ ও পদ-পদবীর লোভ আমাদেরকে অন্ধ, বধির ও পাষণ করে দিয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত আমাদেরকে ভীক, কাপুরুষ ও বিজাতীর করুণার পাত্র বানিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন,

কাফের গোষ্ঠীসমূহ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) একে অপরকে ডাকাডাকি করবে, আহরকারী খাবারের পাত্র ঘিরে যেভাবে ডাকাডাকি করে। তখন এক সাহাবী বলে ওঠলেন, সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো এজন্য? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না, বরং তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে। তবে তোমরা শ্রোতের খড়কুটা বা আবর্জনার মত হবে। আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি উঠিয়ে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ومن (ওয়াহন) ঢেলে দেবেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওয়াহন কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তা হলো) দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুতে অনীহা করা। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৪২৯৭

সম্মানিত পাঠক! আসুন আমরা বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচয় দেই। সারা বিশ্বের সকল মুমিনের প্রতি ঈমানী ভালোবাসা লালন করি। ফিলিস্তিনী মজলুম ভাইবোনদের ব্যথায় ব্যথিত হই। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। অন্তত মহান রাসূলুল আলামীনের দরবারে ব্যথা-বিগলিত অশ্রু ঝরিয়ে

তাদের জন্য দোয়া করি এবং জালেম ইসরাইল ও এর মদদদাতাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। এবং তাদের সকল প্রকার পণ্য বয়কট করি।

দুই.

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শোকর যে, তিনি আমাদেরকে বাতায়নের এগারোতম সংকলন প্রকাশের তাউফীক দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! বাতায়নের দশম সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ। এরপর প্রায় দুইবছর কেটে গেছে। এ বছরগুলিতে মা'হাদ অনেক দূর এগিয়েছে। মা'হাদের কিতাব বিভাগে আরো দু'টি জামাআত (শ্রেণী) যুক্ত হয়েছে। মাত্র নয়জন তালিবুল ইলম নিয়ে মা'হাদ তার পথচলা শুরু করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মা'হাদে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২৫ জন। মা'হাদ ভাড়া বাড়িতে ছিলো। এখন মা'হাদের নিজস্ব ভবন হয়েছে। আলহাজ্ব শাহজাহান কবির সাহেব কর্তৃক ওয়াক্ফকৃত মা'হাদের দশতলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন 'আল-মদিনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের সাততলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং তার প্রথম তিনতলায় নামায ও ফাতাওয়া বিভাগ এবং কিতাব বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ।

আল-মদিনার দক্ষিণ পার্শ্বের প্লটটি মা'হাদের অধীনে 'হাসিনা-আজিজুল হক কওমী মাদরাসা' নামে শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ক্রয় করা হয়েছে। হাসিনা ও আজিজুল হক দম্পতির সন্তানগণ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়ে জমিটি কিনে দিয়েছেন; আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ চলতি মাসেই উক্ত জমিতে মাদরাসার বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এর জন্যও সবার দু'আ কামনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা মা'হাদকে কবুল করুন এবং আমাদের সকলের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দিন। আমীন।

ইসলাম ও কাদিয়ানিয়াত

দুটি আলাদা ধর্ম

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী রহ.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد:

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণার শিকার যে, ‘তারাও ইসলামেরই (?) একটি দল। শুধু শাখাগত কিছু ছোট-খাটো মাসআলায় তাদের সঙ্গে সামান্য বিরোধ আছে। যেকোনো আরো বিভিন্ন ইসলামী ফেরকা ও জামাত মুসলমানদের ভেতর দেখা যায়।’ এজন্যই এ মনোভাব পোষণকারীরা কাদিয়ানীদেরকে ‘মুরতাদ, ইসলাম থেকে খারিজ এবং কাফের’ বিশ্বাস করা ও বলা থেকে এড়িয়ে চলে।

অথচ কাদিয়ানীদেরকে ইসলামের মধ্যকার কোনো ফেরকা বা জামাত মনে করা মারাত্মক ভুল। এ ভুল ধারণার জন্য দায়ী হচ্ছে ইসলাম ও তার বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জানাশোনার অভাব। আর এটা সত্যি আফসোসের বিষয় যে, অনেক মুসলমানেরই ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক অর্থে কোনো ধারণাই নেই।

এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে, প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কিছু মূলনীতি ও বিশ্বাস রয়েছে, যা সেই ধর্মের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। সেসব মৌলিক আদর্শের কারণে উক্ত ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথকভাবে পরিচিতি লাভ করে। তেমনি ইসলামেরও কিছু বুনিয়াদি বিধি-বিধান, নীতিমালা এবং বিশ্বাস রয়েছে। ‘জরুরিয়াতে দীনের’ পর্যায়ে সেই নীতি ও বিশ্বাসের গণ্ডিতে থেকে কোনো মতপার্থক্য ঘটলে তা ব্যক্তির ইসলামের উপর প্রভাব ফেলে না। এমন মতভেদকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডিতেই থাকে এবং তাকে মুসলমানই বলে। কিন্তু যদি কারো সেই বুনিয়াদী আকীদা ও মূলনীতিগুলোর সঙ্গেই বিরোধ থাকে এবং উক্ত বিশ্বাস ও আদর্শকেই মানতে না চায়, তবে সে আর মুসলমান থাকে না। তাকে মুরতাদ ও ইসলাম ত্যাগকারী বলে।

কাদিয়ানী আর মুসলমানদের মধ্যে এধরনেরই মৌলিক ও বিশ্বাসগত বিরোধ বিদ্যমান। এ কারণেই কাদিয়ানী ফেরকা মুরতাদ এবং ইসলাম থেকে খারিজ। এ মতপার্থক্যের কিছুটা বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে করা হচ্ছে, যেন মুসলমানগণ বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক বিষয়টি জানতে পারেন।

এক. ইসলাম এবং মুসলমানদের সঙ্গে কাদিয়ানীদের মৌলিক ও বিশ্বাসগত মতবিরোধের দাবি কেবল আমরা মুসলমানরাই করি এমন নয়, স্বয়ং তাদেরই বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ শাখাগত নয়, মৌলিক।

তাদের বই ‘মজমুআয়ে ফাতাওয়ায়ে আহমদিয়া’র এ উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন-

এটা তো সম্পূর্ণ ভুল কথা যে, আমাদের আর অ-আহমাদীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মধ্যে কোনো শাখাগত মতভেদ আছে। (কেনা,) কোনো মামুর মিনাল্লাহ (তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট)-কে অস্বীকার করা কুফর হয়ে যায়। আমাদের বিরোধীগণ (মুসলমানগণ) মির্যা সাহেবের মামুরিয়্যত (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হওয়াকে) অস্বীকার করেন। বলা, এটা শাখাগত মতপার্থক্য কী করে হয়? (নাহজুল মুসল্লা ফাতাওয়া আহমদিয়া ১/২৭৪)

কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যাপুত্র বশিরুদ্দীন মাহমুদের এ বক্তব্যটি দেখুন-

হযরত মাসীহে মাওউদ আ.-এর মুখ থেকে শোনা শব্দগুলো এখনো আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলেছেন, এটা ভুল কথা যে, অন্যদের (মুসলমানদের) সঙ্গে আমাদের বিরোধ শুধু ঈসা আ.-এর মৃত্যু বা আরো কিছু শাখাগত মাসআলায়। হযরত বলেছেন, আল্লাহর তা’আলার সত্তা, রাসূলে কারীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত তিনি বিস্তারিত বলেছেন, মোটকথা প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ রয়েছে। (মির্যা মাহমুদের জুমার খুতবা, সূত্র: কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত ‘দৈনিক আলফযল’ ৩০ জুলাই ১৯৩১ ঈ. পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১)

যাইহোক, আমাদের মুসলমানদের নিকটও ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে কাদিয়ানীদের মতভেদ মৌলিক, শাখাগত নয়। আর খোদ কাদিয়ানীদের বক্তব্যও এটি যে, তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক, শাখাগত নয়। অতএব, পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলাম ও কাদিয়ানিয়াত দুটি আলাদা ধর্ম।

দুই. একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নবী ভিন্ন হলেই উম্মত আলাদা আলাদা বিবেচিত হয়। মুসলিম উম্মত ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে একারণে আলাদা যে,

তাদের প্রত্যেকের নবী ভিন্ন। যদিও মুসলমানরা হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আ.-সহ আল্লাহর সকল নবীর প্রতিও ঈমান রাখে। কিন্তু আখেরি নবী শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র তাঁর শরীয়তকে আমলযোগ্য মনে করে।

কোন ব্যক্তি শুধু হযরত ঈসা আ.-এর উপর ঈমান রাখলে সে হয় খ্রিস্টান। আর যে শুধু হযরত মূসা আ.-এর উপর ঈমান রাখে, তাকে বলে ইহুদি। মুসলমান বলার উপযুক্ত নয় তারা। কিন্তু কোন ইহুদি অথবা খ্রিস্টান যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে তাঁকে শেষনবী মেনে নেয়, তখন তাকে আর ইহুদি বা খ্রিস্টান বলে না; সে তখন মুসলমান হয়ে যায়।

ঠিক একইভাবে কেউ মির্যা গোলাম আহমদকে নবী বিশ্বাস করলেও সে আর মুসলমান থাকবে না। কেননা, নতুন নবীর প্রতি ঈমান আনার কারণে পূর্বের নবীর উম্মত থেকে সে বের হয়ে নতুন নবীর উম্মতে দাখিল হয়ে যাবে। স্বয়ং মির্যা কাদিয়ানীরও একই বক্তব্য। তিনি বলেছেন-

নবীগণ এক দীন থেকে অন্য দীনে দাখিল করানোর উদ্দেশ্যে আগমন করেন। (কাদিয়ানীর রচিত ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’, রুহানী খাযায়েন ৫/৩৩৯)

অতএব, গোটা কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদকে নবী মানার কারণে ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। তাদেরকে মুসলমান, মুহাম্মদী বা আহমদী বলা জায়েয নেই। তাদেরকে মির্যাঈ, গোলামী ও কাদিয়ানী বলা হবে। তাদের ধর্মের নাম কাদিয়ানী ধর্ম। ইসলাম ধর্ম নয়। এ প্রসঙ্গে কাদিয়ানীর প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের এক ঐতিহাসিক বক্তব্য লক্ষ্য করুন-

তাদের (মুসলমানদের) ইসলাম এবং আমাদের (কাদিয়ানীদের) ইসলাম দুটো আলাদা। (পাঞ্জাবের কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত দৈনিক আলফযল, খণ্ড ২, সংখ্যা ৮৫, পৃষ্ঠা ৬, তারিখ- ৩১/১২/১৯১৪ ঈসাদ্দ।)

তিন. সমস্ত মুসলমানের বুনিয়াদি ও সর্বসম্মত আকীদা হল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, যার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী প্রেরিত হবে না। কুরআনে কারীমের আয়াত-

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ। -সূরা আহযাব (৩৩): ৪০

এছাড়া অসংখ্য হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি., তাবেরঈন এবং সমগ্র মুসলিম জাতির এটিই আকীদা। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। নবুওতের ধারাবাহিকতা তাঁর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন কোনো নতুন নবী আসবেন না।

এটা ইসলামের এমন বুনিয়াদি ও মৌলিক বিশ্বাস, যার ব্যাপারে কোনও ইসলামী দল বা জামাতের দ্বিমত নেই। (পক্ষান্তরে হযরত ঈসা আ.-এর বিষয়টি ভিন্ন। তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের নবী। তাঁর যুগেই তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি তাশরীফ আনবেন, আমাদের নবীর দীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনবেন। নতুন কোনো নবুওয়াত নিয়ে আসবেন না। এজন্য তাঁর আগমনে আমাদের নবীর শেষ নবী হওয়াতে কোনো প্রভাব পড়ে না।)

সকল মুসলমানের বিপরীতে কাদিয়ানীদের আকীদা হল, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নবুওতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়নি।

এজন্য আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তের শ বছর পর এসে মির্যা কাদিয়ানী বিংশ শতাব্দীর মানুষদের লক্ষ্য করে বলছেন-

আমি কোনো নতুন নবী নই। আমার পূর্বে শত শত নবী আগমন করেছেন। (কাদিয়ানীদের সাবেক পত্রিকা ‘দৈনিক আলহাকাম’, ১০ এপ্রিল ১৯০৮ ঈ., পৃষ্ঠা ২, কলাম: ২)

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আরো কিছু বক্তব্য-

সূতরাং তোমরা নবী এবং রাসূলদের মধ্যস্থতা ব্যতীত সেসব নিয়ামত কীভাবে পেতে পারো! অতএব এটা অপরিহার্য যে, তোমাদেরকে ইয়াকীন ও মুহাব্বতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর নবীগণ সময়ে সময়ে আসতে থাকবেন। যাদের মাধ্যমে তোমরা সেই নিআমতরাজি লাভ করবে। (লেকচার শিয়ালকোট, রুহানী খাযায়েন ২০/২২৭)

আমি ঐ খোদার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই আমার নাম ‘নবী’ রেখেছেন। (হাকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট, খাযায়েন ২২/৫০৩)

প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন। (দাফেউল বালা, রুহানী খাযায়েন ১৮/২৩১; বাংলা ‘দাফেউল বালা’ পৃষ্ঠা ১২, ঢাকা বকশী বাজারস্থ আহমদিয়া মুসলিম (?) জামাত কর্তৃক জুলাই ২০১০ ঈসাদ্দে প্রকাশিত।)

আমার দাবি হল, আমি রাসূল এবং নবী। (দৈনিক আলহাকাম, ৫ মার্চ ১৯০৮ ঈ.; মির্যা কাদিয়ানীর ‘মালফুযাত’ ১০/১২৭, পুরাতন সংস্করণ)

এভাবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আমাদের নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওতের সিলসিলা জারি সম্পর্কে নিজের ভিন্ন মনগড়া আকীদা তৈরি করে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে। আর তার অনুসারীরা তাকে হযরত মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নিজেদের নবী হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং খতমে নবুওয়াত সংক্রান্ত কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের অর্থে অপব্যখ্যা করে। তারা আমাদের এ সর্বসম্মত আকীদার অপব্যখ্যা এভাবে করে থাকে-

মহা প্রতাপশালী আল্লাহ আঁা হযরত সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামকে খাতামের অধিকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাকে পরিপূর্ণ আশিসের জন্য মোহর দেওয়া হয় যাহা আর কোন নবীকে কখনো দেওয়া হয় নাই। এই কারণেই তাঁহার নাম খাতামুল্লাবীয়ায়ীন সাব্যস্ত করা হইয়াছে। (অর্থাৎ তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা নবুওয়াত দান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টিকারী হয়।) (হাশিয়ায় হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/১০০; বাংলা ‘হাকীকাতুল ওহী’র টীকা, পৃষ্ঠা ৭৫. বইটি ঢাকা বকশী বাজারস্থ মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯৯ ঈসাদে প্রকাশিত।)

এরূপ আরো বিভিন্ন অপব্যখ্যার মাধ্যমে মির্যা ও তার অনুসারীরা এটা বলে যে, আলোচ্য আয়াতে ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ ‘শেষ’ নয়; বরং এমন সীলমোহর (!) বিশেষ যা ব্যবহার করে করে হুযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতকে নবী বানাতে থাকেন।

অথচ একমাত্র কাদিয়ানীরা ছাড়া গোটা মুসলিম উম্মত এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ যে, প্রিয় নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার আখেরি নবী। সহীহ হাদীসের ভাণ্ডারে এর পরিষ্কার উল্লেখ বিদ্যমান।

একথা স্বতঃসিদ্ধ, সর্বপ্রথম এ বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওতের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা মুসলিম শাসকের দায়িত্ব। এজন্য স্বয়ং নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যখন আসওয়াদ আনাসী নামের লোক নবুওতের দাবি করে, তখন নবীজী সালাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জৈনিক সাহাবীকে তাকে হত্যা করতে আদেশ দেন। সে মোতাবেক লোকটির শিরোচ্ছেদ করা হয়।

সিদ্দীকে আকবার রাযি. খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে ঐ সময়ের নবুওতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা কাযযাব ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ জিহাদে এ ভণ্ড দাবিদার ও তার অনুসারী বিশাল জনগোষ্ঠী নিহত হয়। একইভাবে তুলায়হা আসাদী নবুওতের দাবি করলে সিদ্দীকে আকবার রাযি. তাকেও হত্যার নির্দেশ দেন। সেও নিহত হয়। এভাবে হারেস নামে এক ব্যক্তি যখন নবী দাবি করে, তখন খলীফা আবদুল মালিক সাহাবা ও তাবৈঈন রাযি.-এর সর্বসম্মত ফতোয়ার ভিত্তিতে তাকে হত্যা করে শূলিতে চড়িয়ে দেন। খলীফা হারুনুর রশীদেদের যুগেও এক ব্যক্তির নবুওতের দাবির কারণে আদালতের রায় অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এসবের অর্থ একটাই, ইসলাম ও মুসলমানদের নিকট হযরত মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। তাঁর পরে কোনো ধরনের কোনো নতুন নবী আসবে না। যে তাঁর পরে নবী দাবি করবে সে মুরতাদ। আর যে তাকে নবী মানবে সেও মুরতাদ। আর জানা থাকা উচিত, ইসলামে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা প্রয়োগ করা মুসলিম শাসকের দায়িত্ব। এমনকি স্বয়ং কাদিয়ানী ধর্মও তাদের নবী বরং খলীফাকে অমান্যকারীর শাস্তিও এমন। যেমন তাদের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের বক্তব্য-

আমাকে আল্লাহ খলীফা বানিয়ে দিয়েছেন। এখন না তোমাদের কথায় আমার হটা সম্ভব; না আমাকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা কারো আছে। যদি তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে মনে রেখো, আমার কাছে এমন খালেদ বিন ওয়ালিদ আছে, যে তোমাদেরকে মুরতাদদের মতো শাস্তি দেবে। (তাশহীযুল আযহান, খণ্ড ৯, সংখ্যা : ১১, পৃষ্ঠা ১৪, নভেম্বর ১৯১৪)

চার. সমস্ত মুসলমান এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ যে, পরকালীন নাজাতের জন্য হযরত মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের ওপর ঈমান এবং তাঁর অনুসরণই যথেষ্ট। কিন্তু কাদিয়ানীদের নিকট এটুকু যথেষ্ট নয়। বরং যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদের নবুওতের ওপর ঈমান আনবে, সে চিরস্থায়ী কাফের এবং জাহান্নামী হবে। তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন জায়েয নেই। তার জানাযার নামায পড়াও বৈধ নয়। কাদিয়ানীর বক্তব্য লক্ষ্য করুন-

আর যারা আমার বিরোধী ছিলো, তাদের নাম খ্রিস্টান, ইহুদী এবং মুশরিক রাখা হয়েছে। (নুযূলুল মাসীহ, রুহানী খাযায়েন ১৮/৩৮২)

মির্য়া কাদিয়ানী বলেছেন-

যাহাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করে নাই, তাহারা মুসলমান নহে। (হাকীকাতুল ওহী ২২/১৬৭; বাংলা 'হাকীকাতুল ওহী'; পৃষ্ঠা ১৩০, তায়কিরা পৃষ্ঠা ৫১৯; ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ ঈ.)

তিনি আরো বলেছেন-

শত্রুরা আমাদের জঙ্গলের শূকরে পরিণত হয়েছে। আর তাদের স্ত্রীরা কুকুরনীর চেয়েও নিকৃষ্ট। (নাজমুল হুদা, রুহানী খাযায়েন ১৪/৫৩)

কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলিফা মির্য়াপুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদের বক্তব্য দেখুন-

সকল মুসলমান, যারা হযরত মাসীহে মাওউদ (মির্য়া গোলাম আহমদ)-এর বাইআতে शामिल হয়নি, চাই তারা হযরত মাসীহে মাওউদের নামও না শুনে থাকুক, সবাই কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ। (আয়নায়ে সাদাকাত, আনওয়ারুল উলূম ৬/১১০)

এসব কথার অর্থ হল, সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান, যারা মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানে না, তারা সবাই কাদিয়ানীদের নিকট কাফের, মুশরিক এবং জাহান্নামী। মুসলমান(!) একমাত্র তারাই! (নাউয়ুবিল্লাহ)

পাঁচ. মুসলমান কুরআনে কারীমকে আল্লাহ তা'আলার আখেরি কিতাব বিশ্বাস করে। তাদের ঈমান হল, এরপর আর কোনো বাণী বা কিতাব আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত নাযিল করবেন না। কিন্তু কাদিয়ানীদের নিকট মির্য়ার তথাকথিত ওহী-ইলহামও কুরআনের সমতুল্য। সেসবের প্রতি ঈমান আনা তাদের মতে এতটাই জরুরি, যতটা কুরআনের ওপর ঈমান রাখা জরুরি। আর মির্য়ার মনগড়া ইলহামী বাণীগুলোর তিলাওয়াতও নাকি কুরআন তিলাওয়াতের মতো ইবাদত। মির্য়া সাহেবের ওহীও ঠিক তেমন মু'জেযা যেমন কুরআনে কারীম মু'জেযা।

মির্য়া কাদিয়ানীর বক্তব্য লক্ষ করুন-

খোদার কলাম এত বিপুল পরিমাণে আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে যে, যদি ঐগুলির সব কয়টি লেখা হয় তবে ২০ (বিশ) খণ্ডের চাইতে কম গ্রন্থ হইবে না। (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন

২২/৪০৭; কাদিয়ানীদের অনূদিত বাংলা 'হাকীকাতুল ওহী', পৃষ্ঠা ৩৩১)

মির্য়াপুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদ ২৪ মার্চ ১৯২৮ ঈসাদে ঈদুল ফিতরের খোতবায় একথা বলেছিলেন-

যে আনন্দ এবং ইয়াকীন কুরআন শরীফ থেকে অর্জিত হয়, তা অন্য কোনো কিতাব থেকে হয় না। এমনিভাবে যে আনন্দ এবং স্বাদ হযরত মাসীহে মাওউদ আ.-এর ইলহামসমূহ পড়লে হাসিল হয়, তা অন্য কোনো কিতাব পড়ার দ্বারা হতে পারে না। হযরত মাসীহে মাওউদ আ. নিজ ওহী নিজ জামাতকে শোনাতে আদিষ্ট। আহমদিয়া জামাতের উপর এ ওহীর প্রতি ঈমান আনা এবং সে মোতাবেক আমল করা ফরয। (দৈনিক আলফযল, ৩রা এপ্রিল ১৯২৮ ঈ. পৃষ্ঠা ৬, কলাম : ৩)

ছয়. ইসলামী আকীদা মতে জিহাদ একটি ফরয ইবাদত। এর বিধান ততদিন বাকি থাকবে, যতদিন ইসলাম আছে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় এ বিধানের উল্লেখ আছে। এর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং এর শর্ত-শরায়তে ও নিয়মকানুন বিদ্যমান আছে। কিন্তু মির্য়া সাহেবের দাবি হল, আমার আগমনের দ্বারা জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। বিশেষত ইংরেজদের সঙ্গে জিহাদ করা অকাট্য হারাম। দেখুন তার বক্তব্য-

সুতরাং এখন আমার আবির্ভাবের পর তরবারির কোনো জিহাদ নেই। আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সন্ধির সাদা পতাকা উত্তোলন করা হল। (মজমুআয়ে ইশতিহারাত ৩/২৯৫)

মির্য়া কাদিয়ানী আরো বলেছেন-

এখন বন্ধুরা বাদ দাও জিহাদের চিন্তা। দীনের জন্য এখন যুদ্ধ-জিহাদ করা হারাম।

খোদার দূশমন সে, যে জিহাদ করে। নবীকে অস্বীকার করে সে, যে এ বিশ্বাস (অর্থাৎ জিহাদ বাকি থাকার বিশ্বাস) রাখে। ('তোহফায়ে গোলড়বিয়া'র পরিশিষ্ট, রুহানী খাযায়েন ১৭/৭৭-৭৮)

এ সম্পর্কে তার আরো কয়েকটি বক্তব্য পড়ুন-

মাসীহে মাওউদ (মির্য়া গোলাম আহমদ)-এর আমলে জিহাদের বিধান সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। (আরবাস্টিন, রুহানী খাযায়েন ১৭/৪৪৩)

আজ থেকে দীনের জন্য যুদ্ধ হারাম করা হলো। (খোতবায়ে ইলহামিয়া, রুহানী খাযায়েন ১৬/১৭)

এ তো খুবই ভালো কথা যে, ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা করা হবে এবং জিহাদ করার মন্দ চিন্তা মানুষের মন থেকে দূর করা হবে। (ই'জাযে আহমদী, রুহানী খাযায়েন ১৯/১৪৪)

সাত. ইসলাম ও মুসলমানদের আকীদা হল, আখিয়ায়ে কেরাম আ. সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর চেয়েও মর্যাদাবান। কোনো ব্যক্তি যতই নেককার এবং মুত্তাকী হয়ে যাক, নবীর সমতুল্য সে হতে পারবে না। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং মির্যা গোলাম আহমদের আকীদা হল, মির্যা নিজে সকল নবী বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও শ্রেষ্ঠ। দেখুন নিজের ব্যাপারে তিনি কী বলেছেন-

মরিয়ম পুত্র (ঈসা আ.)-এর আলোচনা বাদ দাও। তাঁর চেয়ে উত্তম গোলাম আহমদ। (দাফেউল বালা, রুহানী খাযায়েন ১৮/২৪০)

একবার কাদিয়ানীর জৈনিক মুরিদ কাযী যহরুদ্দীন আকমাল মির্যা কাদিয়ানী সম্পর্কে একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে। মির্যার সামনে যখন সেই কবিতা আবৃত্তি করা হয়, তখন তিনি খুশি হয়ে এর রচয়িতাকে 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলেছিলেন। দেখুন সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতা-

মুহাম্মাদ আবার নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে/এবং পূর্বের চেয়ে অধিক শান-সম্মানের সঙ্গে।

যে ব্যক্তি পূর্ণতম মুহাম্মাদকে দেখতে চাও/গোলাম আহমদকে এসে দেখো কাদিয়ানে। (আখবারে বদর কাদিয়ান, ২৫ অক্টোবর ১৯০৬ ঈ.)

অর্থাৎ গোলাম আহমদ হচ্ছে নাউযুবিল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুনর্জন্মরূপ। আর এ দ্বিতীয় জন্মে নাকি প্রথমবারের চেয়ে অধিকতর কামেল যোগ্যতাসহ তার আবির্ভাব ঘটেছে। (কবিতাটি শুনে মির্যার জাযাকাল্লাহ বলার সংবাদ ২২ আগস্ট ১৯৪৪ ঈসান্দে কাদিয়ানী পত্রিকা 'আলফযলে' ৪র্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে ছেপেছিল।)

আট. হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলার অতি মর্যাদাসম্পন্ন নবী। কুরআনে কারীম তাঁর প্রশংসা ও সচ্চরিত্রের ঘোষণা দিয়েছে। তাঁর মাকে সিদ্দীকা ও সতী-সাক্ষী আখ্যা দিয়েছে। তাঁর ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের আকীদা এটাই। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ তাঁর সম্পর্কে যেই নাপাক আকীদা পোষণ করে এবং

তাঁর শানে যে জঘন্য বেয়াদবি করে, তা উল্লেখ করা তো দূরের কথা, ভাবলেও গা শিউরে উঠে। কিন্তু কাদিয়ানীদের আকীদা বোঝার জন্য এরও দুয়েকটি উদাহরণ দেখে নিন। মির্যা কাদিয়ানী বলেছেন-

আমি কসম করছি সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মাসীহ ইবনে মারইয়াম আমার যুগে থাকত, তাহলে যেসব কাজ আমি করতে পারছি, কখনোই সে করতে পারত না। আর যেসব নিদর্শন আমার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, সে কখনোই তা দেখাতে পারত না। (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/১৫৩)

এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

হযরত মাসীহের তিন জন দাদী ও নানী ব্যভিচারিণী-দেহপসারিণী ছিলেন, যাদের রক্তে তার জন্ম। (আনজামে আথম-এর পরিশিষ্ট, রুহানী খাযায়েন ১১/২৯১)

তার আরেক বেয়াদবিমূলক বক্তব্য হলো-

এটাও স্মর্তব্য যে, তিনি (হযরত মাসীহ) কিছুটা মিথ্যা বলতেও অভ্যস্ত ছিলেন। (আনজামে আথম-এর পরিশিষ্ট, রুহানী খাযায়েন ১১/২৮৯)

(উল্লেখ্য, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিকট আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং খ্রিস্টানদের যিশুখ্রিস্ট একই ব্যক্তি। তার বিভিন্ন বক্তব্যে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন- 'মূর্খ খ্রিস্টানরা হযরত ঈসাকে খোদা সাব্যস্ত করে রেখেছে।' -হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/৮৯। আরেক জায়গায় স্পষ্ট লিখেছেন- 'বাইবেল এবং আমাদের হাদীসের কিতাবাদীর আলোকে যেসব নবীর স্বশরীরে আকাশে গমনের ধারণা করা হয়, তারা দু'জন নবী। একজন ইউহান্না, যার নাম ইলিয়া এবং ইদরীস। অন্যজন মরিয়ম পুত্র মাসীহ, যাকে ঈসা এবং যিশুও বলে।' -তাওযীহুল মারাম, রুহানী খাযায়েন ৩/৫২; আরো দেখুন, নুসরতুল হক, রুহানী খাযায়েন ২১/৪৩।

সুতরাং হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে মির্যা কাদিয়ানীর বেয়াদবিমূলক বক্তব্যগুলোকে 'খ্রিস্টানদের খণ্ডনে বা প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে' বলে মিথ্যা অজুহাত দেখানোর অবকাশ নেই। কেননা, কাদিয়ানীর নিকট খ্রিস্টানদের যিশু আর মুসলমানদের ঈসা আ. একই ব্যক্তি। বিধায় সর্বাবস্থায় তার ঐসব বক্তব্য হযরত ঈসা আ.-এর শানে চরম বেয়াদবিরূপে বিবেচিত। -অনুবাদক।)

নয়. এছাড়া মির্যা সাহেব কুরআনে কারীমের অজস্র আয়াত, যা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নাথিল হয়েছে, যেমন-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. إِنَّا آَعَطَيْنَاكَ الْكُوفَةَ. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُونِي.

ইত্যাদি অসংখ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নিজেকে সাব্যস্ত করেছেন। (দেখুন, হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/৯৭, তায়কিরাহ ৫১৪, ৬৩১ ও ১৪৬ নম্বর পৃষ্ঠা।) অথচ এসকল আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এমনিভাবে কাদিয়ানীদের নিকট-

- ◇ কাদিয়ানের ভূমি মক্কা-মদীনার মতো পবিত্র। (আনওয়ারুল উলূম ৬/৩৮)
- ◇ কাদিয়ান এলাকায় মির্যা কাদিয়ানীর নির্মিত মসজিদই কুরআনে বর্ণিত মসজিদে আকসা। (খোতবায়ে ইলহামিয়া, রুহানী খাযায়েন ১৬/২১, ২৫)
- ◇ কাদিয়ানের জলসা হজ্জের সমান। (খোতবাতে মাহমুদ ৪/২৫৪-২৫৬)
- ◇ মির্যাকে যারা দেখেছে তারা সাহাবায়ে কেরামের মতো। (খোতবায়ে ইলহামিয়া, রুহানী খাযায়েন ১৬/২৫৮-২৫৯)
- ◇ মির্যার পরিবার নবী পরিবার। তার স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন (মুমিনদের মা)। (সীরাতুল মাহদী ২/১১৭)
- ◇ কাদিয়ানের কবরস্থান সারা ভারতের সকল কবরস্থান থেকে শ্রেষ্ঠ। (তায়কিরাহ- পৃষ্ঠা ৬০০, ৪র্থ সংস্করণ।)

অথচ মুসলিম মাত্রই জানে- এসব বিশ্বাস ইসলাম ও মুসলমানের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

যাইহোক, এ ছিলো কিছু উদাহরণ, যা দ্বারা একথা আমরা মুসলমানদের সামনে প্রমাণ করতে চাই যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কোনো ধর্মের লোক এবং তারা একটি স্বতন্ত্র ধর্মের প্রবক্তা। তাই কোনোভাবেই তারা মুসলিম হতে পারে না। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলার অর্থ প্রকৃত মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করা।

কাদিয়ানীদের উচিত, স্পষ্টভাবে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তারা মুসলিম নয়। তাদের কিতাবও আলাদা, নবীও আলাদা, ধর্মও আলাদা। আর নিজেদের মিথ্যা নবী, মিথ্যা কিতাব এবং মিথ্যা ধর্মকে ইসলাম বা প্রকৃত ইসলাম দাবি করা থেকে বিরত থাকা।

মুসলমানদেরও কর্তব্য, কাদিয়ানীদের মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডা এবং বাতিল অপব্যখ্যায় প্রতারিত না হওয়া। তাদেরকে কাফের মনে করা এবং আপন সত্য দীনের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা। কেননা, তারা মুসলমান নয়। ইসলাম ও তার মূল আকীদার সঙ্গে তাদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের ঈমান-আকীদার হেফাযত করুন এবং সব ধরনের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন- আমীন।

وصلی الله علی خاتم الأنبياء والمرسلین.

ভাষান্তর: মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ফায়েল, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া
মাসিক আলকাউসার, জুমাদাল আখিরাহ-রজব ১৪৪০। মার্চ ২০১৯

জুমু'আর বয়ান মুত্তাকীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মুফতী মাহমুদুল আমীন*

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিলি কারীম। হামদ ও সালাতের পর-

সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম! মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে জুমআর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে হাজির হওয়ার তাউফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

কুরআনে কারীম থেকে বিখ্যাত একটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াত এবং পরবর্তী কিছু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। এসকল আয়াত ও নির্দেশের ওপর আমরা যদি আমল করতে পারি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা জান্নাতী হবো, ইনশাআল্লাহ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাউফিক দিলে এসব আয়াতের তরজমা এবং ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কিছু আলোচনা আমরা করবো, ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম হাজেরিন! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হুকুম বা নির্দেশ করছেন,

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে
যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন। যা তৈরি করা হয়েছে
মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্য। -সূরা আলে ইমরান; আয়াত
১৩৪

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ হলো, আমরা যেন তাঁর ক্ষমা এবং জান্নাত লাভের দিকে অগ্রসর হই।

এই আয়াতে প্রথমত ক্ষমার কথা এসেছে, পরে জান্নাতের কথা। এ থেকে স্পষ্ট হয়, ক্ষমা পাওয়া ছাড়া জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রথমে তাকে

* মুদীর, মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
মুদাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া, চরওয়াশপুর, ঢাকা
খতীব, আজিমপুর সরকারি কলোনি (পার্টি হাউজ) জামে মসজিদ, ঢাকা

আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা লাভ করতে হবে। ক্ষমা লাভের পর আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন।

জান্নাতের আয়তন-সীমানা

জান্নাতের আয়তন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জান্নাতের প্রস্থ হলো, আসমান-জমিনের দূরত্ব'। একেকটা জান্নাতের প্রস্থ এত বিশাল হলে দৈর্ঘ্য কত হবে! একটু কল্পনা করে দেখি।

বিজ্ঞান আজও আসমান-জমিনের দূরত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি। আজও তারা আকাশ খুঁজে পায়নি। বিজ্ঞানীরা এত গবেষণা করেছে, নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্র তাদের কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে, এতকিছুর পরও আকাশ তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঐ জান্নাতের দিকে দৌড়াতে বলছেন। ঐ জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে বলছেন। যার প্রস্থের বিশালতা হলো আসমান-জমিন।

দুনিয়ার ছোট্ট পুট, ফ্লাট-বাড়ির জন্য নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, সরকারি নির্দেশনা এবং আল্লাহর নির্দেশ সবকিছুকে জলাঞ্জলী দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা হচ্ছে, অথচ আমাদের তো দৌড়ানোর কথা ছিলো আল্লাহ তা'আলার জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ হলো আসমান-জমিনসম দূরত্ব। আজকে আমরা উদ্দেশ্য ভুলে গেছি, এই যে ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী জমির জন্য আমরা বিশাল আখেরাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বারবার সেদিকে তাকিদ দিচ্ছেন। কখনো বলছেন,

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

অর্থ : তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে
প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে যাও। -সূরা হাদীদ; আয়াত ২৬

আজকে আমরা দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করি। আমার সহকর্মীর ঢাকা শহরে একটা ফ্লাট আছে, তাহলে আমার দুটি ফ্লাট হতে হবে। তেমনি তার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা আছে, তাহলে আমারও এমন ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ হতে হবে। এগুলোও যথেষ্ট নয়, বিদেশেও আমার বাড়ি-গাড়ি থাকতে হবে। বিদেশের ফিকির। অনেকের মাথায় আজ দেশের চিন্তা-ফিকির নেই। দেশের টাকা কোথায় যাচ্ছে সে চিন্তা নেই। যদি বাংলাদেশের মানুষের এ ফিকির থাকতো যে, আমার টাকা অন্তত দেশে থাকবে, বাহিরে যাবে না। তাহলে দেশের এই অবস্থা হতো না। ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভালোবাসার পাশাপাশি দেশপ্রেম যদি থাকতো তাহলে আমাদের দেশ সোনার দেশ হয়ে যেত।

মুহতারাম হজিরিন! কেন আমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম ভুলে গিয়েছি? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বানিয়েছেন জান্নাতের জন্য। দুনিয়া তো হবেই। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আর বসবাসের জায়গা হবে না, এমন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেই আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দশতলা বা গাছতলা কোনভাবে আমাদের জীবন কেটেই যাবে। কেউই চিরদিন থাকবে না। সকলেরই পরকালে যেতে হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাওয়ার আগে দ্রুত তোমার রব থেকে ক্ষমা নিয়ে নাও। আর জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও।

জান্নাতের দিকে দৌড়াও অর্থ হলো, জান্নাত পাওয়া যাবে যে সকল নেক আমলের মাধ্যমে, সেদিকে তোমরা দৌড়াতে থাকো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে জান্নাত পাওয়া যাবে, রমজান মাসে রোযা রাখলে জান্নাত পাওয়া যাবে, জাকাত প্রদান করলে জান্নাত পাওয়া যাবে, তেমনি বাবা-মায়ের খেদমত করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। সন্তানকে নেক বানিয়ে গেলে জান্নাত পাওয়া যাবে। মানুষের সেবা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। গোনাহমুক্ত থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে। এসব কাজের দিকে দৌড়াও, অর্থাৎ যে সকল কাজ করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে, সেসকল কাজ করে তুমি জান্নাতী হয়ে যাও।

মুহতারাম হাজেরিন! আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

لِيَمِثِلَ هَذَا فُلَيْعَمَلٍ اَلْعَمِلُوْنَ

অর্থ : এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।

—সূরা সফফাত; আয়াত ৬১

অর্থাৎ যারা আজকে কাজ করতে চায়, কর্মোদ্দমী, তাদের উচিত এই জান্নাত লাভের জন্য কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের নেয়ামতরাশীর বিবরণ দিয়ে আরও বলেন,

وَفِيْ ذٰلِكَ فُلَيْتَنَافَسِ اَلْمُتَنَفِّسُوْنَ

অর্থ : এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। —সূরা

মুতাফফিফীন; আয়াত ২৬

অর্থাৎ যারা প্রতিযোগিতা করতে চায়, তারা জান্নাত হাসিলের জন্য প্রতিযোগিতা করুক। আল্লাহ তা'আলার হুকুম হলো, আমি প্রতিযোগিতার সাথে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবো। দুনিয়া কামানোর জন্য প্রতিযোগিতা নয়, দুনিয়া প্রয়োজন পরিমাণ আসবেই। অতএব, বৈধ উপায়ে যখন আমি তার জন্য চেষ্টা-মেহনত করবো, তাহলে এর দ্বারা আমার দুনিয়াও হবে, আখেরাতও হবে।

আল্লাহ তা'আলা সন্যাসজীবনকে নিষেধ করে দিয়েছেন। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়ার বিধান আমাদের ধর্মে নেই। আমাদের ধর্মে আছে যে, তুমি সংসার করো, মানুষের সাথে ওঠাবসা করো, কাজ-কারবার সবকিছু করো। তবে এসব কিছুর মধ্যেও তুমি আখেরাত অর্জন করে নাও। দুনিয়ার এই কাজ-কারবার তোমার মাকছাদ বা মূল লক্ষ্য যেন না হয়। তোমার মূল মাকছাদ বা গন্তব্য তো আখেরাত।

মুহতারাম হাজেরিন! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আমরা তা ভুলে গেছি। আমাদের হায়াত ব্যাবসা, আমাদের ধন-সম্পদ ব্যাবসার পুঁজি। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কুচরিত্র সম্পর্কে বলেন, 'তারা সে সমস্ত লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত, তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হিদায়াতও লাভ করতে পারেনি' (সূরা বাকারাহ; আয়াত ১৬)। অর্থাৎ তারা যে আখেরাতকে বাদ দিয়ে তাদের পুঁজি দুনিয়ার পিছনে ব্যয় করেছে, এতে তারা লাভবান হয়নি; বরং তাদের পুঁজি পুরোটাই ধ্বংস হয়েছে।

আমাদের সময় নামক যে পুঁজি ছিলো, যে পুঁজি বিনিয়োগ করে আখেরাতের অনন্ত-অসীম কালের প্রাসাদ এবং অগণিত নেয়ামত অর্জন করতে পারতাম। আজকে আমরা ঐ দামি পুঁজিকে দুনিয়ার পিছনে নষ্ট করে দিচ্ছি। কেউ টিভির সামনে বসে খেলা দেখে শেষ করছে, কেউ মোবাইলে ফেসবুক-ইউটিউব দেখে দেখে নষ্ট করছে। অথচ এই সময় সে যদি এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কাজও করতো যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সংসারের দায়িত্ব দিয়েছেন, সরকার আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে, আমি এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আমার সাংসারিক প্রয়োজন নির্বাহ করবো, তাহলে সে দুনিয়াবি কাজ করেও সওয়াব পেয়ে যেত। তার হিসাবও দিতে পারতো। কিন্তু এই খেলা দেখে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কী অর্থ আছে! এর দ্বারা না দুনিয়া অর্জন হলো, না আখেরাত। কিছুই তো অর্জন হলো না। এভাবে যদি অসদ্যবহার করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত 'তারা তাদের ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি' প্রযোজ্য হয়ে যাবে (নাউযবিলাহ)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথমে বলেছেন, 'দ্রুত অগ্রসর হও'। অতঃপর বলেছেন, জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। জান্নাতে যেতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। অতএব, তুমি যদি জান্নাতে দ্রুত যেতে চাও তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং বিধি-নিষেধ যথাযথ পালন করো, তাহলে তোমার জন্যই জান্নাত প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমার জন্যই জান্নাত সজ্জিত ও সুশোভিত হয়ে

আছে। অনেকে মনে করে জান্নাত প্রস্তুত করা হবে, আসলে তা এমন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। যদি আমরা মুত্তাকী হই তাহলে আমরা তা অর্জন করতে পারবো।

জান্নাতীদের প্রথম গুণ : সর্বাবস্থায় দান করা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীর পরিচয় বর্ণনা করেন। যাদের জন্য এই বিশাল জান্নাত তারা কারা? তাদের বৈশিষ্ট্য কী? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

অর্থ : যারা স্বচ্ছলতায় এবং অভাবের সময় ব্যয় করে। -সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩৫

এটা হলো মুত্তাকীদের প্রথম গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তারা ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে। আজকে আপনার ভাই অসহায় কিংবা আপনার প্রতিবেশি অসহায় আর আপনার কাছে অটেল টাকা-পয়সা আছে, তাহলে আপনি তাদেরকে দান করুন। যদি কখনো এমন অবস্থা হয় যে, হাতে কিছুই নেই। সাংসারিক খরচেই টানাটানি তখনও আপনি কিছু দান করুন। দশ হাজার দিতে না পারলেও দশ টাকা দিয়ে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ তা'আলার জান্নাতী বান্দাদের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নিয়মিত স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় গরিব-দুঃখীদের দান-সদকা করে সহযোগিতা করে থাকে। এখন একটু নিজের সাথে মিলিয়ে দেখি, আমার মাঝে কি মুত্তাকীদের এই বৈশিষ্ট্য আছে। আমি কি গরিব-দুঃখীদের নিয়মিত সহযোগিতা করছি? এমনকি এমনও হয় যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যায়, আমার পকেট থেকে গরিব-দুঃখীদের জন্য কোন দান-সদকা বের হয় না। এজন্য আমরা একটা নিয়ম বানিয়ে নেই, আমি প্রতি মাসের এত তারিখে এত টাকা দান করবো।

আমাদের পূর্বসূরী আল্লাহওয়ালাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তারা তাদের বেতনের একটা অংশকে গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। কেউ উশর তথা দশ ভাগের একভাগ দিতেন, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতেন। আপনি সামর্থ্য থাকলে আরও বেশি বাড়িয়ে দান করুন। তো আপনার বেতন বাড়ার সাথে সাথে আপনার দানের পরিমাণও বাড়বে। আমার এক মুসল্লী ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, হুযূর! আমি ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে মসজিদে দান করে আসছি। আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকে তিনি নিয়মিত দান করে আসছেন। দানের পরিমাণ বেশি নয়। কিন্তু এত বছর নিয়মিত দান করার কারণে অনেক দান জমা

হয়ে গেছে। আল্লাহর খাজানায় তো দান-সদকা বাড়তে থাকে। দুনিয়ার মানুষ লাভের আশায় ব্যাংকে টাকা রাখে। যদিও এই লাভ স্পষ্ট সুদ এবং হারাম। তারপরও তারা রাখে। শতকরা ১৩/১৪ টাকা লাভের আশায় তারা ব্যাংকে টাকা রাখে। অথচ আমরা এক টাকা দিলে আল্লাহ তা'আলা সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেন। ইখলাসের সাথে একটা খেজুর পরিমাণ দান করলে আল্লাহ তা'আলা তা উহুদ পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন। এজন্য অল্প অল্প হলেও আমরা নিয়মিত দান করার চেষ্টা করি।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে অসহায়। লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তাদেরকে খুঁজে বের করি এবং আমার আয়ের একটা অংশ থেকে নিয়মিত তাদের সহযোগিতা করি। ইনশাআল্লাহ আমার অল্প-সামান্য দান পরকালে জান্নাত লাভের মাধ্যম হবে। ফলে আমি জান্নাতী হয়ে যাবো। তো আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন, তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

সব সময় হয়তো প্রয়োজনহীন লোককে পাবো না। তারপরও আমি আমার বেতন থেকে প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখে দানের টাকা আলাদা করে নেই। আর সে টাকা মাটির ব্যাংক কিংবা থলিতে জমিয়ে রাখি। যখন কোন দরিদ্র লোককে পাবো তাকে সেই টাকা দিয়ে দেব অথবা মসজিদ-মাদরাসায় দিয়ে দিবে। মোটকথা, নেকি ও সওয়াবের কাজে দান করে দিব, গোনাহের কাজে ব্যয় করবো না। তাহলে ইনশাআল্লাহ এই মুত্তাকীদের যে বৈশিষ্ট্য এবং গুণের কথা বলা হয়েছে তা অর্জন করতে পারবো।

দশ টাকা করে দান করলে মাসে তিনশ টাকা হয়ে যায়। দশ টাকা দান করা সবার জন্য সম্ভব। এজন্য আমি আমার মাদরাসার তালিবে ইলিমদেরকে বলেছি, তোমরা প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা করে দান করার অভ্যাস বানিয়ে নাও। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বেশি বেশি দান করার তাউফিক দান করুন।

জান্নাতীদের দ্বিতীয় গুণ : ক্রোধ সংবরণ করা

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের দ্বিতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

অর্থ : যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে। -সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩৫

রাগ উঠলে সে পাগল হয়ে যায় না। মানুষ আজ রাগের কারণে বউকেও তালাক দিয়ে দেয়। এরপরে হুযূরের কাছে এসে মাসআলা জানতে চায়- রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দিয়েছি, তালাক হয়ে গেছে নাকি? আমরা বলি যে, রাগের মাথায়

আপনি আপনার বিবির মাথায় গুলি করলে সে কি মারা যেত? হ্যাঁ, অবশ্যই মারা যেত। তাহলে রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। হাদীসে পরিষ্কার এসেছে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই তালাক দিক, হেসে হেসে দিক বা রাগ অবস্থায় দিক সর্বাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। এখন রাগ হয়ে তালাক কেন দিলেন। রাগকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করেননি কেন? হাদীস শরীফে এসেছে,

সে ব্যক্তি বাহাদুর নয় যে দুশমনকে পরাভূত করে ফেলে। বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। -সহীহ বুখারী; হাদীস ৬১১৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার আরেকটি হাদীস,

কারও প্রতি রাগ হলো এবং সে এই রাগ প্রয়োগ করতেও সক্ষম তবু সে তাকে ক্ষমা করে দিল, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন ডেকে বলবেন, এই দেখ হুঁ- যাকে তোমার পছন্দ হয় নিয়ে নাও। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৪৭৭৭

আরেকবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন,

আল্লাহর রাসূল! কতবার আমি খাদিমকে মাফ করবো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলেননি। অতঃপর আবার সে একই কথা পুনরাবৃত্তি করলো, তখনও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশুপ ছিলেন। তৃতীয়বার যখন সে পুনরাবৃত্তি করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, তুমি তাকে প্রতিদিন সত্তর বার ক্ষমা করো। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৫১৬৪

অর্থাৎ তুমি তাকে যথাসম্ভব ক্ষমা করতে থাকো, আল্লাহ পাকও তোমাকে ক্ষমা করবেন। আমাদের ভাবা উচিত, আমি আজকে তার ওপর সক্ষম, আল্লাহও তো আমার ওপর কাদের এবং সক্ষম। আমি আল্লাহ পাকের কত অন্যায় করছি, আল্লাহ তো আমাকে ক্ষমা করছেন। অন্য হাদীসে আছে 'দৈনিক একশ বার অন্যায় করলে একশ বার মাফ চাইতে থাকো'

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বললেন, জান্নাতী বান্দার দ্বিতীয় গুণ হলো, সে রাগের সময় ক্রোধ সংবরণ করে। আজকে বিবি-বাচ্চার ওপর রাগ প্রয়োগ করা হয়। অবুঝ শিশু, ছোট বাচ্চা অন্যায় করে ফেলেছে তাকে বেধড়ক প্রহার করা হয়। বাবা-মা যখন অন্যায়ভাবে সন্তানকে প্রহার করে এই বাবা-মা জালিম। কিয়ামতের ময়দানে এই সন্তান আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করবে।

নাবালগে বাচ্চাদেরকে আঘাত করতে নেই। তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে শাসন করতে হয়।

জান্নাতীদের তৃতীয় গুণ : মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

অর্থ : আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। -সূরা ; আয়াত

অর্থাৎ যারা মানুষের ভুল-ত্রুটির ওপর কঠোর হয় না; বরং দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেয়।

জান্নাতীদের চতুর্থ গুণ : সৎকর্মপরায়ণতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : বশ্তুত, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালোবাসেন।

অর্থাৎ যারা সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের উপকার করে, অন্যায়ভাবে কোন ক্ষতি করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন। তাহলে এই আয়াতে মুত্তাকীদের চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল। এক) যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে। দুই) যারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিন) যারা মানুষকে ক্ষমা করে। চার) যারা সৎকর্মপরায়ণ এবং মানুষের উপকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।

জান্নাতীদের পঞ্চম গুণ : গোনাহের উপর অটল না থাকা

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী মুত্তাকীদের পঞ্চম গুণের বিবরণ দিয়ে বলেন,

তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। -সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩৫

অর্থাৎ কারও থেকে কখনও কোন অশ্লীল কাজ হয়ে গেলে বা গোনাহের মাধ্যমে নিজের ওপর জুলুম করে বসলে, পরক্ষণে আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে যায়। দিলের ভেতর তার অনুশোচনা জেগে ওঠে, হায়! আমি গোনাহ করে ফেলেছি। আমি আমার মাবুদের নাফরমানি করে ফেলেছি, বেগানা নারীর দিকে ইচ্ছাকৃত তাকিয়ে আমি আমার রবকে তো নারাজ করে নিয়েছি। কোন অন্যায় করে

ফেললে আল্লাহর স্মরণে এভাবে যাদের অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে আর যে গোনাহ হয়েছে তার উপর অটল থাকে না এবং এ কথাও সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া মাফ করার আর কেউ নেই, অতঃপর আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আজকে মোবাইলে কারও গোনাহ হয়ে গেছে, সে তওবা করে ফেলে। আবার গোনাহ হয়ে যায়, আবার তওবা করে নেয়। এভাবে সে তওবা করতেই থাকে। এখানে মানুষ নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায় যে, বারবার গোনাহ করে আর বারবার তওবা করার কী লাভ! তওবার তিনটি শর্ত আছে—

(এক) গোনাহের ওপর অনুতপ্ত হওয়া।

(দুই) গোনাহ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করা।

(তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প করা।

আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার হক-অধিকার আদায়ের পর এই তিন শর্ত পূর্ণ করে কেউ যদি তওবা করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার তওবা কবুল করবেন। এভাবে সকালে গোনাহ হয়ে গেছে, বিকালে তওবা করে নিয়েছে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাফ চেয়ে নেয়। শয়তান যতবার গোনাহ করিয়ে ফেলে সে ততবার আল্লাহকে ডাকে আর মাফ চায়। হাদীস শরীফে আছে

যে ব্যক্তি ইসতেগফার করে, আল্লাহর কাছে মাফ চায়, সে দৈনিক সত্তর বার গোনাহ করলেও সে গোনাহগার নয়।' —সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ১৫১৪

এজন্য শয়তানের কথা শুনবো না, গোনাহ করবো না, এই প্রতিজ্ঞার সাথে আমরা তওবা করি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। তো জান্নাতী বান্দার বড় একটা গুণ হলো, সে গোনাহ নিয়ে বসে থাকে না। গোনাহের ওপর অটল থাকে না।

আজকে অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা হলো, একটা গোনাহ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তওবা করে না। মনে করে সময় আছে— আজ না কাল তওবা করে নেব বা পরশু করে নেব। এভাবে আজ না কাল করতে করতে একসময় মালাকুল মউত তার দরবারে এসে হাজির। তখন আর তার তওবার সুযোগ হয় না। ফলে সে তওবা ছাড়াই কবরে চলে যায়। এজন্য আমরা নিয়মিত তওবা করার চেষ্টা করি। আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক সত্তর থেকে একশ বার তওবা-ইসতেগফার করতেন। যার কোন গোনাহ নেই তিনি এতবার আল্লাহর কাছে মাফ চান, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে! এজন্য আমরা

বেশি বেশি তওবা-ইসতেগফার করি, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল গোনাহকে মাফ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এসকল লোক যারা স্বচ্ছলতায় এবং অভাবের সময় দান করে, যারা রাগকে সংবরণ করে, যারা মানুষকে মাফ করে দেয়, মানুষের উপকার করে, যারা গোনাহ নিয়ে বসে থাকে না— গোনাহ হয়ে গেল আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে তওবা করে— তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রশ্রবণ; যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান! —সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩৬

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে কারীমে বর্ণিত এসকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার তাউফিক দান করুন এবং জান্নাতী হওয়ার তাউফিক দান করুন। আমিন।

প্রফেসর হযরত রহ. যেমন ছিলেন

মুহাম্মাদ আদম আলী*

প্রফেসর হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, দুনিয়া তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাহাম-বেহাম। তিনি একা একাই দীর্ঘ পথ চলেছেন। শুরুতে কেউ তাকে চিনতো না। গুরুত্ব দিতো না। তিনিও এসবের পরোয়া করতেন না। পরে যখন অনেকে তাকে চিনে ফেললো, তখন তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। এত ব্যস্ততার ভীড়েও তিনি আগের মতোই থাকলেন। সবার সঙ্গে থেকেও তিনি একাই ছিলেন। এরকম একা না থাকতে পারলে অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ধরে রাখা যায় না। এ ভালোবাসা এতই মূর্ত ছিলো যে, জবানে তাঁর আল্লাহর কালাম লেগেই থাকত!

মানুষের মেজাজে খটখটি থাকে। অপছন্দের কাউকে দেখলেই চোখ ভড়কে যায়। তাকাতে ইচ্ছে করে না। কথা বলা তো আগুনে ঝাপ দেওয়া! তিনি এসব মেজাজকে খুব ভালো করেই শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন। শয়তান বা নফসের দখল নিতে পারেনি। তার আত্মাটা সাদা ছিলো। কোনো কালিমা ছিলো না। তার এতো কুরআন-প্রেমই এর প্রমাণ। কালো অন্তরে কুরআন থাকে না!

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো আকাশ-ছোঁয়া। কথা বলতেন হিসেব করে। হিসেব করে যারা কথা বলেন, তাদের কথা না শুনে উপায় থাকে না। সালেকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো পিতৃতুল্য। ভুল হলে ধরপাকড় করতেন। এতে সালেকরা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তো। অস্থিরতা কমানোর ঔষধও জানতেন তিনি। এজন্য কেউই দূরে সরে যায়নি। কুরআনের আয়াতের মর্ম তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। এই বুঝের সঙ্গে ছিলো আমল। এমন আমলদার মানুষ আসমানী মানুষ না হয়ে পারে না!

ভালো মানুষ দান-খয়রাত করে। অন্যকে খাওয়াতে পছন্দ করে। তাদের অনেকে এসব কথা গোপন রাখতে পারে না। বলে বেড়ায়। প্রফেসর হযরত এসব কাজ অগোচরেই করতেন। প্রায়শই তাঁর দফতরে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে হাজির হতো। তাদের চেনা যেতো না। হযরতের সঙ্গে দেখা

* খলীফা, প্রফেসর হযরত রহ.।

করেই আবার নাই হয়ে যেতেন। এরকম অনেক অপরিচিত মানুষ ছিলো তাঁর। তারা ছাড়া কেউ জানে না, তিনি তাদের জন্য কী করেছেন!

এখন ঘরে ঘরে অশান্তি। শান্তি যেন আকাশের তারা হয়ে গেছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারেও টাকার জোয়ারে শান্তি আনা যাচ্ছে না। আসলে টাকায় শান্তি আসেও না। শান্তি লাভের সংজ্ঞাই যে ভিন্ন। এই ভিন্নতার স্বাদ প্রফেসর হযরত পুরোপুরি পেয়েছিলেন। তিনি পারিবারিক অশান্তি দূর করতে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করে দেওয়ার জন্য নিজের জান-মাল খরচ করেছেন। ঘরোয়া মাহফিল করতেন। সবাই যেন ‘সাকিনা’ লাভে ধন্য হয়, সেই চেষ্টা করেছেন আজীবন। এ ধরা তাঁর মতো মানুষ ফের কবে পাবে, কে জানে!

ঘরোয়া মাহফিলের ব্যাপারে তাঁর একটি শ্লোগান ছিলো। হারদুই হযরত রহ.-এর অনুকরণেই তিনি বলতেন- নো ফুড, নো ড্রিংকস। হারদুই হযরত রহ. ইংরেজিতে কথাটা বলেননি; এটি প্রফেসর হযরতের সংস্করণ। সামাজিক প্রথাকে অতিক্রম করা সহজ নয়। দীনী মাহফিলে যারা আসে, মানুষ তাদের আপ্যায়ন করতে পছন্দ করে। কিন্তু এ আপ্যায়নের কারণে একই ঘরে বেশি বেশি মাহফিল করা সম্ভব হয় না। আবার আপ্যায়নের ভয়ে অনেকে ঘরে মাহফিল করতেও সাহসী হয় না। এ প্রথাকে ভাঙার জন্য তিনি সারাজীবন কথাটি বলেই গেছেন। কেউ মেনে চলেছে, কেউ মানেনি। এজন্য তিনি কাউকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেননি। তবে যারা মানতে পেরেছে, তারা ঠিকই বুঝেছে, ঘরোয়া মাহফিল করা কত সহজ এবং বরকতময়!

তাঁর কর্মব্যস্ততার কোনো তুলনা ছিলো না। মানুষের উপকারে এত বেশি দৌড়ঝাপ করতেন যে, বেশিরভাগ রাতই নিরুঘ্ন কাটিয়েছেন। এক-আধ ঘণ্টার ঘুমকে তো কেউ ঘুম বলবে না। সফর আর গাড়িতেই কেটেছে তার জীবনের বেশিরভাগ সময়। তার বিখ্যাত কথা, ‘দুনিয়া পরিশ্রমের জায়গা। কবরে গিয়ে বিশ্রাম কইরো।’

দুনিয়াতে সবাই বাড়ি-গাড়ি চায়। একটু সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকার আশা করে। এতে নিষেধও নেই। হযরত সেই ১৯৬১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। তার ব্যাচের কেউ কোটিপতি না হয়ে মারা যাননি। অনেকে আমলা-মন্ত্রীও হয়েছেন। হযরত সেদিকে পা মাড়াননি। বাবার ইন্তেকালের পর তিনি যে অসহায়ত্বের মধ্যে ‘বড়’ হয়েছেন, সেটিকেই আজীবন সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিলেন। শুরুতে পরিস্থিতির চাপে, পরে স্বেচ্ছায়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি করেননি। প্রমোশনও পাননি। বুয়েটে এসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের ছাব্বিশটি বছর। আর এ সময়টিই ছিলো তার স্বর্ণযুগ। দুনিয়া ত্যাগ করলে ঐশী নেয়ামতে ধন্য হওয়া যায়। তার জীবনে এ নেয়ামতের কোনো কমতি ছিলো না। তবে তিনি সন্যাস-জীবন যাপন

করেননি। দুনিয়ার কাজে যে সময় গিয়েছে, তার চেয়ে বেশি আখেরাতের পথে খরচ করার জন্য মরিয়া হয়ে থাকতেন। পরিপূর্ণভাবে প্রফেসনালী একজন ব্যক্ত মানুষ হয়েও নিজেকে আল্লাহওয়ালাদের কাতারে নিয়ে গেছেন। তার এই সাফল্য ঈর্ষণীয়। এই সাফল্যগাঁথা লিখে শেষ করা যাবে না।

হাফেজ্জী হুযূর রহ.-কে কোথাও নেওয়ার বড়শির টোপ ছিলো মকতব-মাদরাসা। তার শ্লোগান ছিল- আটমটি হাজার গ্রামে আটমটি হাজার মকতব। প্রফেসর হযরত এ শ্লোগানকে উচ্চকিত করেছেন। এটিকে নিজের কাজ বানিয়ে নিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশে যেখানেই মকতব-মাদরাসা থেকে ডাক এসেছে, তিনি গিয়েছেন। মারাত্মক অসুস্থতা কিংবা দুর্গম পথ বাধা হতে পারেনি। শেষ দিকে গাড়িতে শুয়ে শুয়ে সফর করতেন। অন্যরা দেখে বলত, ‘এ তো শারীরিক সক্ষমতা নয়, আত্মিক শক্তি।’ এ শক্তিতে কী প্রচণ্ডভাবেই না তিনি বলীয়ান ছিলেন!

পাকিস্তান আমলে এদেশে খুব দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করেছে ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানী। এ কোম্পানীতে যারা চাকুরী করতেন, তারা খুব হাই-ফাই জীবনযাপন করতেন। চলন-বলনও ছিলো খুব ডাটের। প্রফেসর হযরত এখানে ছয় বছর চাকুরী করেছেন (১৯৬৩-১৯৬৯)। কোম্পানী থেকে সেই আমলে গাড়ি পেয়েছিলেন। আনলিমিটেড ফুয়েল বরাদ্দ ছিলো তাঁর এই গাড়ির জন্য। এসময় তিনি একজন আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্য লাভ করেন। এই আল্লাহওয়ালার কোনো নাম-ডাক ছিলো না। কোনো সভা-সমাবেশে তাকে ডাকা হতো না। তার নাম মাওলানা আব্দুল্লাহ রহ.। তিনি শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক রহ.-এর সহপাঠী ছিলেন। একজন ছিলেন সূর্য, আরেকজন অমাবস্যার চাঁদ। মাওলানা আব্দুল্লাহ রহ.-এর সান্নিধ্য তার মধ্যে যুহদের গুণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তার সান্নিধ্যে আসার এক বছরের মধ্যেই প্রফেসর হযরত একটি বিশেষ কারণে কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে দেন। কারণটা খুবই সিম্পল। তিনি মার্কেটিং-এ ছিলেন। এজন্য তাকে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে যেতে হতো। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এসব ক্লায়েন্টদের গিফট-এর শুরুতে ঘুষ দিতে বলা হলো। প্রফেসর হযরত রাজি হলেন না। বিশাল বেতনের চাকুরী ছেড়ে বুয়েটে জয়েন করেন। দীনের কারণে দুনিয়া ত্যাগের নমুনা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। এভাবেই তার মধ্যে এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে, যা আজ বিরল।

পিতৃপুরুষগণ জৈনপুর সিলসিলাভুক্ত ছিলেন। হযরত সেদিকে যাননি। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী রহ.-এর মাওয়ায়েয তার চিন্তাভাবনাকে থানভী সিলসিলার দিকে ধাবিত করে। প্রফেসর হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর প্রসিদ্ধ খলীফা মাওলানা আলতাফ হোসেন রহ.-এর নিকট সর্বপ্রথম বাইআতের

বিষয়ে আলোচনা করেন। কারও নিকট বাইআত হওয়ার আশ্রয় ব্যক্ত করেন। মাওলানা আলতাফ হোসেন রহ. বিলম্ব না করে তখনই তাকে হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর নিকট নিয়ে যান এবং বাইআত করিয়ে দেন। তারপরই হযরতের জীবনে নতুন রং ধরে। আল্লাহর রঙে রঙ্গীন হওয়ার যে স্বপ্ন, তার বাস্তবায়ন শুরু হয়।

বাইআত শেষে হাফেজ্জী হুযূর রহ. হযরতকে বলেন, ‘চোখের গোনাহ থেকে বাঁচেন।’ এই কথা হযরতের মনে ঢেউ তুললো। এতদিন জানা ছিলো, আমল ছিলো না। বাড়িতে গিয়েই আমল শুরু করলেন। বাসায় যারা গাইরে মাহরাম ছিলেন, তাদের সাফ জানিয়ে দিলেন- এখন থেকে পর্দা করতে হবে। সেই শুরু। এরপর আর পেছন ফিরেননি। পরে বলেছেন, ‘তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের কাছে এ কথা আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আমলের তাওফীক হয়নি। হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলার পর থেকে আল্লাহ আমলের সুযোগ করে দিয়েছেন।’ আমতু্য তিনি এই চোখের গোনাহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। বড় বড় মাশায়েখগণ বলেন, ‘এই যামানায় যারা চোখের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, সে নিশ্চিত আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে।’ এ কথার প্রমাণ হযরত রেখে গিয়েছেন।

সফরেই তার আখলাকের বেশি প্রকাশ ঘটতো। হজের সফরে বেশি। মানুষ বলতো, ‘প্রফেসর হযরতের সঙ্গে হজ করা মানে মায়ের কোলে বসে হজ করা!’ এ যামানায় কে কবে কার জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করেছে! অন্যান্য সফরেও একই অবস্থা হতো। তিনি সফর-সঙ্গীদের খুব দেখভাল করতেন। তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। খাওয়া বা ঘুমানোর সময় সবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে নিজের দিকে নয়র দিতেন। তাকে এড়িয়ে কিছু করা সম্ভব হতো না।

তিনি হাফেজ্জী হুযূর রহ. এবং হারদুই হযরত রহ.-এর খলীফা ছিলেন। আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি ছিলেন এক সমুজ্জ্বল ব্যক্তি। তাসাওউফে যেসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় এবং যেসব সদগুণাবলী ধারণ করতে বলা হয়, তিনি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘আমার কোনো খানকা নেই। আমি যখন যেখানে থাকি, সেটিই আমার খানকা।’ এজন্য সফরসঙ্গীরা তার সোহবতে বেশি উপকৃত হতে পারত। তিনি সঙ্গীদের আচার-আচরণ খুব যত্নসহকারে খেয়াল করতেন। তাদের কুরআন পড়ার অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন। যাদের সহীহ নেই, অনেক সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গে শেখানো শুরু করতেন। তিনি ছিলেন মোবাইল শিক্ষক। কাউকে কিছু শেখানোর ইচ্ছা হলে নিজেই খাতা-কলম কিনে আনতেন। যে নাহ-সরফের কিছুই জানে না, তাকেও আরবি ক্রিয়াপদের সবক দিতেন। কিছু আয়াত নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি

দেখাতে চেষ্টা করতেন, একটুখানি চেষ্টা করা হলেই কুরআনের সঙ্গে কীভাবে আরও গভীরভাবে পরিচিত হওয়া যায়।

হযরত খুব বেশি কুরআন পড়তেন এবং তিলাওয়াত শুনতেন। নতুন কোনো হাফেজ তার সোহবতে এলে তটস্থ থাকতো। কি জানি কোন সূরা থেকে পড়তে বলেন! কুরআনের এই চর্চা, সহজবোধ্য ভাষায় কুরআনের তরজমা শেখানোর আকৃতি এবং তিলাওয়াত শুদ্ধ করার আশ্রয় প্রচেষ্টার জন্যই তিনি যুগ যুগ ধরে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার কীর্তি যারা অনুসরণ করবে, নিঃসন্দেহে তারাও দামী হয়ে উঠবেন।

এখন অনেক পীর-বুয়ুর্গদের হাদিয়া-তোহফা নেওয়া বা এর পদ্ধতি দেখে লোকজন তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রফেসর হযরত হাদিয়া-তোহফা নিতেন। তবে এতে কিছু মূলনীতি অনুসরণ করতেন। তিনি প্রকাশ্যে কখনো হাদিয়া নিতেন না। প্রথম সাক্ষাতেও কারও নিকট হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। দীনী মাহফিল শেষে আয়োজকদের নিকট থেকেও কখনো হাদিয়া গ্রহণ করেননি; বরং তিনি নিজ খরচেই বেশিরভাগ ঘরোয়া মাহফিল করে গিয়েছেন। সেটা ঢাকায় হোক, কিংবা দেশের অন্য কোনো জেলায়। তার এই কঠোর নীতির কারণে মাহফিল শেষে কেউ তাকে হাদিয়া দিতে সাহসও করেনি। ইবাদত ও দুনিয়াদারির মধ্যে এত সুচিন্তিত পার্থক্য কে কবে দেখেছে!

আধুনিক পৃথিবীতে আত্মীয়তা রক্ষা ও মেহমানদারিতে তার মতো ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখা যায়। দীনদারি না থাকায় আত্মীয়দের যতই করা হোক, তারা সহজে শোকর করে না; বরং বিরুদ্ধাচরণ করে, অপদান-অপদস্তও করে। প্রফেসর হযরত আত্মীয়দের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান আশা করতেন না। তিনি সারাজীবন তাদের জন্য করেই গিয়েছেন। নিজে না খেয়ে তাদের খাইয়েছেন; ধারকর্য করে হলেও তাদের সেবা করেছেন। বুয়েটে চাকুরীর সময় ঢাকায় তার বাসায় আত্মীয়দের ভিড় লেগেই থাকত। এমনকি অনেক সময় রাতে ঘুমানোর জায়গা থাকত না। তিনি কত রাত যে রান্না ঘরে পিঁড়িতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন, তার হিসেব নেই। এভাবে নিঃস্বার্থ মানবিকবোধ যার রক্তে রক্তে আসন গেড়েছিল, তিনি সাহাবী যুগের মানুষ হবেন, এটা কিছুতেই অতুষ্টি হতে পারে না! এজন্যই অনেক বিদেশী মেহমান তার সাক্ষাতে এসে বলেছেন, ‘সাহাবীদের এক নমুনা দেখেছি!’

প্রফেসর হযরত নিজেকে ‘আলেমদের জুতাবাহক’ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অথচ উলমায়ে কেরাম তাকে ‘দীনের ফকীহ’ কিংবা ‘মাওলানা’ বলে সম্বোধন করতেন। তার দীনী ইলম ও চর্চা, আমল ও একনিষ্ঠতা, বিনয় ও বদান্যতা এবং সর্বোপরি অনবদ্য এক মহান ব্যক্তিত্ব সত্যি অবিশ্বাস্য। এসবের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যারা জানার, তারা জানেন। নিঃসন্দেহে এ যুগে কোনো ইংরেজি

শিক্ষিত দীনদারের পক্ষে তার মতো ‘ভালো মানুষ’ হওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।

এক জীবনে প্রফেসর হযরত রহ. যা করে গিয়েছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। তার বর্ণাঢ্য জীবনের আলোচনা হতেই থাকবে। আল্লাহ তাঁর সব কাজকে কবুল করেন। তার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন। তার ফয়েয ও বরকতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন। আমীন।

ফিলিস্তিন : অতীত থেকে বর্তমান

মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল*

যারা পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণনা করেন, তারা ইতিহাস শুরু করেন প্রস্তর যুগ থেকে। তখনো কোনো খনিজ পদার্থ আবিষ্কার হয়নি। শিকারের প্রয়োজনে মানুষ হাতিয়ার তৈরি করত পাথর দিয়ে। তাই এই যুগের নাম প্রস্তর যুগ। এই প্রস্তর যুগের চারটি পর্ব: ১. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ পর্ব। ২. কৃষি ও জনপদ পর্ব। ৩. পেশা হিসেবে কৃষি ও জনপদ পর্ব। ৪. ধাতু আবিষ্কার পর্ব।

প্রস্তর যুগের এই সবগুলো পর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ফিলিস্তিনে পাওয়া গেছে। এমনই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এ অঞ্চল। কেনই বা হবে না! আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন-

وَجِئْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.

আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক ভূমিতে নিয়ে গেলাম,
যেখানে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি। -সূরা আশ্বিয়া;
আয়াত ৭১

এ অঞ্চলে বছর জুড়ে বৃষ্টি হয়। সারা বছর তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক। শীত কিংবা গ্রীষ্ম সবসময়ই তাপমাত্রা থাকে ১৯-২৭ ডিগ্রির মধ্যে। ফিলিস্তিন হল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলনস্থল। এ দেশের অফুরান বরকতের দরুন স্রণাতীত কাল থেকে মানুষ এখানে বসবাস করে আসছে। নগরায়ণের জন্য এখানেই মানুষ সর্বপ্রথম সমবেত হয়েছিল। তা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দের কথা। সেই নগরের নাম আরীহা।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালে মানুষ ব্রোঞ্জ যুগে প্রবেশ করে। এসময় মানুষ টিন আবিষ্কার করে। সেই সাথে তামা মেশানো ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হয়। তখন মানুষ প্রচুর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে থাকে। এই ব্রোঞ্জ যুগকেও তিন ভাগে ভাগ করা

হয়- প্রাচীন (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০-২০০০), মধ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৫৫০ পর্যন্ত) ও আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০-১২০০)।

ফিলিস্তিনের আদিনিবাসী

প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে কেনআনীরা এসে ফিলিস্তিনে বসবাস শুরু করে। এ জাতির প্রতিটি শাখা আরব বংশোদ্ভূত। জায়িরাতুল আরব থেকে তারা ফিলিস্তিনে অভিবাসন গ্রহণ করেছিল। তারা ছিলো মূর্তিপূজারি। এর সপক্ষে দলীল- দস্তাবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব নেই। এতে ইহুদীরা যে দাবি করে, তারা ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা- এর অসারতা প্রমাণ হয়। তাদের হাতে বিকৃত তাওরাতও স্বীকার করে, ইহুদীদের আগে কেনআনীরাই ফিলিস্তিনের বাসিন্দা ছিলো। নাবলুস, বাইসান, আক্কা, আসকালান, হাইফাসহ দুই শতাধিক শহর তারা গড়ে তুলেছিল। ইহুদীদের ফিলিস্তিন প্রবেশের ১৪০০ বছর পূর্বে তারা আগমন করে। কেনআনীদের একটি শাখা হল, ফিনিশিয়ান সম্প্রদায়। তাদেরই অবদান ইতিহাসখ্যাত ফিনিশিয়ান সভ্যতা। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী ফিলিস্তিনী এলাকায় বসবাস করত।

আমোরীয়রা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরেকটি সম্প্রদায়। তাদের থেকেই এসেছে হেকসোস সম্প্রদায়। আলকুদসের গোড়াপত্তন তাদের অন্যতম কীর্তি। তারা এ শহরের নাম দিয়েছিল, উরসালিম।

এ যুগের কয়েক শ বছর পর ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী। তারা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রিট থেকে। এরাও ইহুদী ছিলো না। তারা এ অঞ্চলের নাম রেখেছিল বালিস্তিন। সেখান থেকেই পরিবর্তন হয়ে ফিলিস্তিন হয়েছে।

ফিলিস্তিনে ইবরাহীম আ.-এর আগমন

মধ্যব্রোঞ্জ যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৫৫০) ৪৫০ বছরের এই ধাপটি ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগেই এখানে ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে প্রথম তাওহীদের প্রকাশ ঘটে। যখন তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে (খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০) ফিলিস্তিনে আসেন তখন ছিলো হেকসোসদের শাসনামল। তারা মূর্তিপূজারি হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলো। তারা ইবরাহীম আ.-কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেয়। এখানেই হযরত ইসমাঈল আ.-এর জন্ম। এ হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনের শেকড়ের সম্পর্ক। ইসমাঈল আ.-এর জন্মের ১৩ বছর পর ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব আ.। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে তিনি বেশ তাৎপর্যের অধিকারী। ইবরাহীম আ.-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব আ. জন্মগ্রহণ করেন। একসময় ইয়াকুব আ. হিজরত করে বর্তমান

* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, আলকাউসার ত্রৈমাসিক নারী

তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চল হাররানে চলে যান। সেখানে তার এগার সন্তানের জন্ম। পরে আবার তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। ইয়াকুব আ.-এর আরেক নাম ইসরাইল (অর্থ আল্লাহর বান্দা)। সেই হিসেবে তার বংশধরদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয়। ইউসুফ আ. একসময় ইয়াকুব আ.-কে সপরিবারে মিশরে নিয়ে যান। ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইয়েরা প্রায় ১৫০ বছর মিশরে বসবাস করেন। সেটা ছিলো হেকসোসদের আমল। আগেই বলা হয়েছে, তারা ছিলো ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

একসময় ফারাও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আহমোসের কাছে হেকসোসরা পরাজিত হয়। ফারাওরা বনী ইসরাইলকে মনে করত হেকসোসদের সহযোগী। তাই বনী ইসরাইলের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুম-নির্যাতন। এ নির্মমতা চলে ৩ শ বছর পর্যন্ত। এই সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে ব্যাপক ধস নামে, যেসব স্বভাব-চরিত্রে বর্তমানে আমরা তাদের চিনি। ভয়, লাঞ্ছনা, মিথ্যা তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। একপর্যায়ে তারা তাওহীদ ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়।

মূসা আ.-এর আগমন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে তাদের মাঝে মূসা আ. প্রেরিত হন। তার আগে জন্ম হয় হারুন আ.-এর। নানান জুলুম-নির্যাতন অতিক্রম করে, ফেরাউনের লোহিত সাগরে সলিল সমাধির মধ্য দিয়ে বনী ইসরাইল মিশর ত্যাগ করে সিনাই উপত্যকায় আসে। সেখানে তারা নানান বিশৃঙ্খলা করে নবী মূসা ও হারুন আ.-কে যারপরনাই কষ্ট দেয়। একপর্যায়ে তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। শহর রক্ষা প্রাচীরের কাছে যাত্রাবিরতি দেয়। বিরতির পর মূসা আ. তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে বললে তারা এই বলে অস্বীকৃতি জানায়, এখানে এক পরাক্রমশালী জাতির বাস। এই পরাক্রমশালী যোদ্ধা জাতি ছিলো কেনআনীরা।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ তারা তীহ প্রান্তরে উদ্ভাস্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। এসময়ে মূসা আ.-এর ইত্তিকাল হয়। মূসা আ.-এর ইত্তেকালের ১০ বছর পর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১৯০ সালে ইউশা আ. বনী ইসরাইলকে নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনে বসবাস করতে থাকেন। তার জীবদ্দশায়ই বনী ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা করে। ইউশা আ.-এর ইত্তেকালের পর ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়। এসময়ের মধ্যে তাদের অবাধ্যতা চরমে পৌঁছে। পৌত্তলিকতা তাদের ওপর চেপে বসে। তাদের প্রিয় তাবুত, যার মধ্যে মূসা আ.-এর লাঠি ছাড়াও অন্য আরও পবিত্র বস্তু ছিলো, তারা হারিয়ে ফেলে। নানান ঘটনার পর তালুতের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সে যুদ্ধে দাউদ আ.-ও অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৬ বছর। তিনি দুষ্ট শাসক জালুতকে হত্যা করেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি

জালুতের ওপর বিজয় লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ ঈসাবে দাউদ আ. আলকুদস শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সবচেয়ে বড় ইহুদী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তা ছিলো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৭৪% অঞ্চল। এটাই ছিলো ফিলিস্তিনে ঈমান ও আহলে ঈমানের প্রথম আধিপত্য। ফিলিস্তিনে ইবরাহীম আ. কেবল দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। ইউশা আ. ফিলিস্তিনের খুব বেশি এলাকা দখলে আনতে পারেননি। দাউদ আ. চল্লিশ বছর শাসন করেন। তাঁর ইত্তেকালের পর সুলাইমান আ. উত্তরাধিকারী হন। তিনি দাপটের সঙ্গে শাসন করেন। তাঁর প্রভাবের সামনে বনী ইসরাইল মাথা নুইয়ে রাখলেও তাঁর ইত্তেকালের পরপরই ইহুদীরা পুরোনো চরিত্রে ফিরে যায়। সুলাইমান আ.-ও ৪০ বছর শাসন করেন। তিনি বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। ইহুদীরা যে ওখানে সুলাইমানী ট্যাম্পল থাকার কথা দাবি করে, নানান অনুসন্ধান করেও তার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বনী ইসরাইলের ছিলো ১২টি গোত্র। সুলাইমান আ.-এর ইত্তেকালের পর তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজনের নেতৃত্বে ১০ গোত্র একত্রিত হয়। বাকি দুই গোত্র একত্রিত হয় অন্য একজনের নেতৃত্বে। ১০ গোত্র ফিলিস্তিনের উত্তরে গড়ে তোলে ইসরাইলী সাম্রাজ্য। অন্য দুই গোত্র দক্ষিণ ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইয়াহুয়া সাম্রাজ্য। এরা ছিলো ইয়াহুয়া ও বিনইয়ামিনের বংশধর। বিশৃঙ্খলা ও পৌত্তলিকতায় উভয় সাম্রাজ্যই বরাবর ছিলো।

সেই ইসরাইলী সাম্রাজ্য ২০২ বছর টিকে ছিলো। একপর্যায়ে তারা অ্যাসিরিয়ানদের হাতে পরাজিত হয়। অ্যাসিরিয়ানরা ছিলো ইরাকের অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ এ তারা ইসরাইলী সাম্রাজ্যে হামলা করে। তারা সবকিছু তছনছ করে দেয়। অধিকাংশকে বন্দি করে পৃথিবীর নানান প্রান্তে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এভাবে ইহুদীদের ১০ গোত্র ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইয়াহুয়া সাম্রাজ্য আরও ১৫০ বছর টিকে ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে আল্লাহ তাদের ওপর আবার ধ্বংসলীলা চাপিয়ে দেন। ইরাকের সেনাপতি বখতে নসর ফিলিস্তিন আক্রমণ করে ইহুদীদের তছনছ করে দেয়। মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দেয়। ৪০ হাজার ইহুদীকে বন্দি করে ইরাকে নিয়ে যায়। এর মধ্যে দিয়ে ইহুদী শাসনের অবসান ঘটে। যা ৪১৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল। যার মধ্যে ৮০ বছর ছিলো দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর ঈমানী শাসন। বাকি ৩৩৮ বছর ছিলো ফেতনা-ফাসাদ ও জুলুম-নিপীড়নের ইহুদী শাসন। বখতে নসরের ধ্বংসযজ্ঞের দীর্ঘ কাল পর তারা ফিলিস্তিনে ফিরে আসে।

ইরাকে যাওয়ার পর তারা তাওরাত সংকলন শুরু করে। এটা মূসা আ.-এর ইত্তেকালের ৭০০ বছর পরের কথা। কারণ তাবুত ও তাওরাতের ফলক চুরি হয়ে গিয়েছিল।

ইয়াহুয়া সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন শাসনের সূচনা হয়। এ শাসন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৩৯ পর্যন্ত ৪৭ বছর স্থায়ী হয়। তখন পারসিক ও ব্যাবিলনদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ ছিলো চরম পর্যায়ে। ইহুদীরা সাইরাসের নেতৃত্বে থাকা পারসিকদের সহায়তা করলে ব্যাবিলনীর পরাজয় বরণ করে। ফিলিস্তিন চলে যায় পারসিকদের দখলে। পারসিকরা ২০৭ বছর ফিলিস্তিন শাসন করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে রোমান সেনাপতি আলেকজান্ডার পারস্যকে পরাজিত করে। তারাও মুশরিক ছিলো। ইহুদীরা তখন আলেকজান্ডারের অধীনে বসবাস করতে থাকে। রোমানরা খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সাল থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন শাসন করে। রোমানরা ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর। বেশির ভাগ ইহুদী রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। অল্প কিছু ইহুদী বিকৃত ধর্মের ওপর অটল থাকে।

এরপর ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর থেকে ৩০০ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিনে অল্প কিছু মানুষই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ৩২৪ ঈসাদে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর মা আগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গোটা রোমান সাম্রাজ্যেই খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পৌত্তলিকরাও দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের চিন্তা-চেতনার প্রভাব খ্রিস্টধর্মেও পড়ে। যার ফলে খ্রিস্টধর্ম এক বিকৃত রূপ নিয়ে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এসময় রোমানরা মসজিদে আকসার কাছেও যায়নি। ফিলিস্তিনে রোমান শাসন ৩১২ বছর স্থায়ী ছিলো। একেবারে মুসলমানদের ফিলিস্তিন বিজয়ের আগ পর্যন্ত।

৫৭০ ঈসাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবুওয়াত লাভ করেন (আনুমানিক) ৬০৯ ঈসাদে। কিছুকাল তিনি মসজিদে আকসা অভিমুখে নামায আদায় করেন। নবুওয়াত লাভের দ্বাদশ বছর প্রথম বাইআতে আকাবা ও দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার মাঝামাঝি সময়ে ইসরা (সশরীরে বাইতুল মাকদিস গমন) ও মিরাজ (বাইতুল মাকদিস থেকে উর্ধ্বাকাশ গমন) সংঘটিত হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে তখনকার বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের মাঝে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হয়। রোমানরা পরাজিত হয়। বিশ্বাসের দিক দিয়ে রোমানরা মুসলমানদের কাছাকাছি অর্থাৎ আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তাদের পরাজয়ে নবীজী ও সাহাবায়ে কেরাম মর্মান্বিত হন। পরে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে। আহযাব যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিন জয়ের সুসংবাদ দেন।

অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিলিস্তিন, দামেশক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানীর কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান। শুরাহবিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতকে হত্যা করে। পরিণামে মৃত্যুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মনোযোগী ছিলেন। ওফাতের এক মাস আগে তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। নবীজীর ওফাতের কারণে এ বাহিনী অভিযানে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে। খেলাফতের বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর আবু বকর রাযি. সর্বপ্রথম এ বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। ৩০ রবিউল আউয়াল ১২ হিজরী/১৪ জুন ৬৩৩ ঈসাদে শাম জয়ের বিষয়ে পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। সভায় সবাই শাম অভিযানের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। শাম অভিযানের জন্য তিনি মুজাহিদ বাহিনী গঠনে মনোযোগী হন। আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতকাল ছিলো মাত্র ২ বছর ৬ মাস। এই অভিযান পূর্ণতা লাভের আগেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।

ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসন

উমর রাযি.-এর শাসনামলে রবিউল আখির ১৬ হিজরী/মে ৬৩৭ ঈসাদে আলকুদস শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়। তখন উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিনামাটি আলকুদসের কিয়ামাহ গির্জায় আজও সংরক্ষিত আছে। মুসলিম শাসকেরা বরাবরই এ চুক্তি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ১৯ হিজরীতে মুআবিয়া রাযি.-এর হাতে কায়সারিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাতে চলে আসে। মুসলমানদের আগমনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। শাম অঞ্চলের প্রথম মুসলিম গভর্নর ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাযি.। তখন ফিলিস্তিনও শামের অংশ ছিলো। ১৮ হিজরীতে আমওয়াস মহামারিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তারপর মুআয ইবনে জাবাল রাযি. গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিও মহামারিতে ইন্তিকাল করেন। তারপর গভর্নর নিযুক্ত হন ইয়াযীদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাযি.। তিনিও মহামারিতে ইন্তিকাল করেন। এরপর মুআবিয়া রাযি. গভর্নর নিযুক্ত হন। উসমান রাযি.-এর পুরো শাসনামল জুড়ে তিনি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। উসমান রাযি.-এর খেলাফতের শেষের দিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওসব ফিতনায় শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায় না। ফিতনার ওই সময়টাতে তাঁরা মুআবিয়া রাযি.-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

মুআবিয়া রাযি.-এর মাধ্যমে উমাইয়া খেলাফতের [৪১-১৩২ হিজরী/৬৬০-৭৫০ ঈসাদ] সূচনা হয়। এসময়টা ছিলো ফিলিস্তিনের জন্য উন্নতি ও অগ্রগতির সময়। ১৩২ হিজরী/৭৫০ ঈসাদে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসী খেলাফত। ১৩২-৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত ৫২৪ বছর এ খেলাফত স্থায়ী হয়। ১৩২-২৪৭ হিজরী পর্যন্ত ১১৫ বছর ছিলো আব্বাসী খেলাফতের সোনালী যুগ। ২৪৭-৬৫৫ হিজরী পর্যন্ত ৪০৯ বছর দুর্বলতার যুগ। উমাইয়াদের মতো আব্বাসীরাও ফিলিস্তিনকে খুব গুরুত্ব দিত। তবে সেটা উমাইয়াদের পর্যায়ে ছিলো না। কারণ, উমাইয়াদের রাজধানী ছিলো দামেশকে, যা ফিলিস্তিনের কাছে। আব্বাসীরা দারুল খিলাফত বাগদাদে স্থানান্তর করে। দূরত্বের কারণে যত্নে কিছুটা ঘাটতি পড়েছিল।

আব্বাসী খেলাফতের দুর্বলতার কালে আব্বাসীয় গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন ২৫৪ হিজরী/৮৬৮ ঈসাদে আব্বাসী শাসন থেকে বেরিয়ে যান। তিনি স্বাধীন তুলুনী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ২৬৪ হিজরী/৮৭৭ ঈসাদে তিনি ফিলিস্তিন অধিকার করেন। ফিলিস্তিন ৫৭ বছর তুলুনী রাজ্যের অধীনে ছিলো। এ শাসনামলের সুনাম ইতিহাসে বেশ উজ্জ্বল। ৩২১ হিজরীতে মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ৩৮ বছর ইখশীদীরা ফিলিস্তিন শাসন করেন। এ আমল ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম শাসনামল বলে বিবেচিত হয়। ইখশীদী সুলতানেরা ফিলিস্তিনকে এতটাই গুরুত্ব দিত যে, কোনো খলীফার ইত্তিকাল হলে লাশ দাফন করতে মসজিদে আকসায় নিয়ে যেত। এতকিছুর পরও এ আমলে এসে ফিলিস্তিনে সামরিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদীদের পতনের পর এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে।

ফিলিস্তিনে শিয়া শাসন

৩৫৯ হিজরীতে উবায়দিয়ারা মিশর দখল করে। একই বছর তারা ফিলিস্তিন দখল করে। তারা ছিলো নিকৃষ্টতম শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কমবেশি একশ বছর তারা মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তারা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সুন্নী আলেমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। উবায়দিয়াদের দখলের মধ্য দিয়ে এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে ফিলিস্তিন। উবায়দিয়ারা প্রথমে একাধারে ১০৪ বছর ফিলিস্তিন শাসন করে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াত শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে। সুন্নী উলামায়ে কেরামকে হত্যা করে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে মিশর ও ফিলিস্তিনে। উবায়দিয়া সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ৬০ বছরের শাসক মুস্তানসির লিদীনিল্লাহ-এর আমলে উবায়দিয়ারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়- মুস্তালিয়া ও নিয়ারিয়া।

মুস্তানসিরের আমলেই ৪৩২ হিজরী/ ১০৪১ ঈসাদে উত্তর আফগানিস্তান ও পূর্ব ইরানে তুর্কী বীর সালজুক ইবনে দুক্কাকের হাত ধরে সালজুক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। এরা ছিলো আকীদায় সুন্নী। ৪৬৩ হিজরীতে সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে তুর্কী সেনাপতি আতসিয় ইবনে উভাক উবায়দিয়াদের হাত থেকে ফিলিস্তিন উদ্ধার করেন। তবে এই সেনাপতি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করে সেলজুক শাসন থেকে আলাদা হয়ে যান। একপর্যায়ে আল্প আরসালানের ছেলে তুতুশ ইতিয়সকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তিনি তার এক সেনাপতি আরতুক ইবনে আকসাবকে ফিলিস্তিনের দায়িত্ব দেন। আরতুক ৪৭১-৪৮৯ হিজরী পর্যন্ত ১৮ বছর ফিলিস্তিন শাসন করেন। দীর্ঘ দুঃশাসনের পর এই সময়টা ছিলো ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই উত্তম সময়। তুতুশ জালিম হলেও তার নিযুক্ত শাসক আরতুক ছিলেন খুবই ন্যায়পরায়ণ।

৪৮৯ হিজরীতে ৩ বছরের জন্য উবায়দিয়াদের মুস্তালিয়া ফেরকা আবার ফিলিস্তিন দখল করে। সুকমান ইবনে আরতুক ও গাজী ইবনে আরতুককে ফিলিস্তিন থেকে বহিস্কার করে। তাঁরা তুরস্কের দক্ষিণে হিজরত করেন। সেখানে তাঁরা আরতুক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে বিশাল অবদান। এবারও উবায়দিয়ারা সুন্নী আলেমদের হত্যায় মেতে ওঠে।

ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন

এবার নতুন আগ্রাসনের কবলে পড়ে উবায়দিয়ারা। ধৈর্যে আসে ক্রুসেডাররা। ৪৯০ হিজরী/১০৯৭ ঈসাদে পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ক্রুসেডাররা প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তারা খুব সহজে কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে। কারণ, তখন তিনি ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্যস্ত ছিলেন গাজী ইবনু দানেশমান্দকে পরাজিত করতে। তখন সালজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিলো। তাছাড়া উবায়দী শিয়াদের দীর্ঘ গোমরাহীপূর্ণ শাসন মুসলিম চেতনাকে মিইয়ে দেয়। এসব কিছু ক্রুসেডারদের জন্য ফিলিস্তিন প্রবেশ সহজ করে দেয়।

৪৯২ হিজরী/৭ জুন ১০৯৯ ঈসাদে ক্রুসেডাররা আলকুদসে পৌঁছে। পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ২০ শাবান ৪৯২ হিজরী/১৫ জুন ১০৯৯ ঈসাদে আলকুদসের পতন ঘটে। ক্রুসেডাররা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে। পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ক্রুসেডারদের আনাগোনা এ পর্যায়ে এসে মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৯০ হিজরীতে রুহা রাজ্য, ৪৯১ হিজরীতে আন্তাকিয়া রাজ্য, ৪৯২ হিজরীতে বাইতুল মাকদিস রাজ্য, ৫০৩ হিজরীতে তারাবলুস ও তার

আশপাশ মিলিয়ে আরেকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ মুহাররম ৫০৭ হিজরী/১১১৩ ঈসাদে ইরাকের বীর মওদুদ ইবনে তুনকাতিনের হাতে সিন্ধাবরাহ রণাঙ্গনে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন যেনকীর। তখন তার বয়স ২৪ বছর। তিনি এতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন।

ইমাদুদ্দীন যেনকী ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ৫৩০ হিজরী/১১৩৬ ঈসাদে লায়িকিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। অকল্পনীয় গণীমত লাভ করেন। এরপর একে একে তিনি মুসলিম বিশ্বে গজিয়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন। এভাবে সূচিত হয় যেনকী সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ৫৪১ হিজরীতে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন। রেখে যান চার সন্তান। এর মধ্যে নুরুদ্দীন যেনকী ও সাইফুদ্দীন গাজী বাবার অসমাপ্ত মিশন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন। ৫৪৫ হিজরী পর্যন্ত নুরুদ্দীন রহ. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন। ৫৪৮ হিজরীতে দুঃখজনকভাবে আসকালান ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। আসকালান ছিলো ফিলিস্তিনের একমাত্র স্বাধীন মুসলিম অঞ্চল। যদিও শাসকরা ছিলো উবায়দী। তারা নুরুদ্দীন রহ.-এর কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠায়। মাঝখানে প্রতিবন্ধক ছিলো দামেশকের শাসক। তাই তিনি প্রথমে দামেশক জয় করেন। তিনি ফিলিস্তিন জয় করতে মিশরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সে ব্যবস্থাও করে দেন। উবায়দী শাসক আলআযিদ বিল্লাহ ২৭/২৮ বছর বয়সী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে মিশরের প্রধানমন্ত্রী বানান। তার ধারণা ছিলো, তরুণ আইয়ুবীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর দৃঢ়তায় তার এ খায়েশ ভেঙে যায়। তিনি ৫৬৭ হিজরী/১১৭১ ঈসাদে ২০৮ বছরের ওবায়দী শাসনের বিলুপ্তি ঘটান। উবায়দীরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে আতাত করে বহুবার মিশর দখল করতে চাইলেও তা ব্যর্থ হয়। এর মাত্র ২ বছর পর ১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরীতে নুরুদ্দীন রহ. দামেশকে ইত্তিকাল করেন।

নুরুদ্দীন রহ.-এর মৃত্যুর পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী জিহাদের হাল ধরেন। বিভক্ত মুসলিম রাজ্যগুলোকে একীভূত করেন। ২৪ রবিউল আউয়াল ৫৮৩ হিজরী/৪ জুলাই ১১৮০ ঈসাদে হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমান ছিলো মাত্র ১২ হাজার। ক্রুসেডার ছিলো ৬৩ হাজার। যুদ্ধের ফলাফল কল্পনাভীতভাবে মুসলমানদের অনুকূলে ছিলো। হিত্তীন যুদ্ধের পরের দিন টাইবেরিয়াসের সবচেয়ে বড় দুর্গ জয়ে রওয়ানা হন। সহজেই তা বিজয় করেন। হিত্তীন যুদ্ধের ৫ দিন পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আক্কা অবরোধ করেন। এক দিনের মধ্যেই এই শহরের পতন ঘটে। আক্কার পর তিনি নাসিরিয়া জয় করেন। সালাহুদ্দীন

আইয়ুবীর ভাই আদিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ইয়াফা ও নাবলুস শহর জয় করেন। এসব ঘটনা হিত্তীন বিজয়ের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে। এরপর তিনি লেবানন অভিমুখে রওয়ানা হন। লেবাননের অর্ধেক তখন বাইতুল মাকদিস রাজ্যের অধীনে ছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন বাইতুল মাকদিস রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। ২১ জুমাদাল উলা তিনি সাইদা গিয়ে পৌঁছান। সাইদা জয় করে বৈরুত যাত্রা করেন। আট দিন অবরোধের পর বৈরুতের পতন হয়। জাবিলবাসী আত্মসমর্পণ করে। ১৬ জুমাদাল উখরা আসকালান অবরোধ করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে আসকালানের পতন ঘটে। রামাল্লা অভিমুখে সৈন্য পাঠান। একে একে গাজা, তিবনিন, বেথেলহাম ও বাইত জিবরীন জয় করেন। আলকুদস বাদে গোটা ফিলিস্তিন তিনি মাত্র দুই মাসে জয় করে ফেলেন।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর আলকুদস জয়

১৫ রজব ৫৮৩ হিজরীতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আলকুদস অবরোধ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শহরের পাদ্রী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী টানা ১২ দিন মিনজানিক দিয়ে অব্যাহত আক্রমণ করে যান। হামলার ভয়াবহতা দেখে ক্রুসেডাররা শান্তি প্রস্তাব করে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা দীর্ঘ ৯২ বছর মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করেছ, আমি তোমাদের সাথে সে আচরণই করব।

ক্রুসেডাররা জবাবে বলে, আমরা আমাদের সন্তান, নারী ও পশুদের হত্যা করব। তারপর বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেব। আমাদের হাতে বন্দি ৫ হাজার মুসলমানকেও জবাই করব। তারপর মরণপণ লড়াই করব।

এ জবাব শুনে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী দ্বিধায় পড়ে যান। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বাইতুল মাকদিস হস্তান্তরের পর জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ২৭ হিজরী রজব মাসে আলকুদস শহর মুসলমানদের হাতে আসে। ক্রুসেডাররা মসজিদে আকসাকে এতটাই অপরিচ্ছন্ন করেছিল যে, তা পরিষ্কার করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এ বছর ঈদুল আযহা আল-কুদসে উদযাপন করেন।

৫৮৫ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝিতে ক্রুসেডাররা গাই ডি লুসিগনানের নেতৃত্বে সুরের নিকটবর্তী শহর আক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে। লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আট মাস বন্দি রাখার পর মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সুরে গিয়ে পরাজিত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়। ওয়াদা ভঙ্গের দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী খুবই ক্ষিপ্ত হন। তিনি আক্কায়ে পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা আক্কায়ে পৌঁছে যায় এবং শহর

অবরোধ করে। ক্রুসেডারদের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল শক্তিমত্তার দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ব্যর্থ হন। পূর্ণ দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এর মধ্যে বাইতুল মাকদিসে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার জন্য ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। এটা ছিলো তৃতীয় বৃহত্তম ঐক্য। প্রথম ঐক্য ছিলো প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সময়। যা খুবই সফল হয়েছিল। তাদের মাঝে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐক্য হয়েছিল রুহা রাজ্যের পতনের পর। ক্রুসেডের এ অভিযান নুরুদ্দীন যেনকী ব্যর্থ করে দেন। এর কোনো ফলাফল ছিলো না। আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইয়্যুফা, আসকালান, কায়সারিয়া, আরসোফ, হাইফা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইতিকাল করেন।

তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা চরম সংকটে নিপতিত হয়। ক্ষমতা নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মুসলমানদের বিবাদ-বিসংবাদের নয় বছর পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এর মধ্যে ক্রুসেডারদের হাতে বৈরতের পতন ঘটে। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য দেখে ইউরোপীয়রা বিপদ আঁচ করতে পারে। ৫৯৯ হিজরী/১২০২ ঈসাদে চতুর্থ ক্রুসেড শুরু হয়। কিন্তু এ ক্রুসেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ক্রুসেডাররা আলকুদসের পরিবর্তে বাইজান্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দিকে ধাবিত হয়। তারা বাইজান্টাইন সম্রাটকে হত্যা করে কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। তারা স্বজাতির ওপর হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।

আদিল ৫৯৮-৬১৫ হিজরী পর্যন্ত মুসলিমবিশ্ব শাসন করেন। তিনি এ দীর্ঘ সময়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করেননি। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হন। ফলে ৬১৫ হিজরীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় পঞ্চম ক্রুসেড। অভিযানের কথা শুনে আদিল মিশর ছেড়ে ফিলিস্তিন রক্ষার্থে ছুটে আসেন। ক্রুসেডারদের বিপুল সংখ্যার কথা শুনে তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্য দামেশকে যান। আদিলের মিশর ত্যাগের কথা জেনে ক্রুসেডাররা মিশরের প্রধান বন্দর দিময়াতে অবতরণ করে। এসময় দামেশকে আদিলের ইতিকাল হয়। মিশর জুড়ে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়। মানসূরার সীমান্তে ইসলামী শক্তি ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে কামিল ক্রুসেডারদের কাছে খুব অপমানকর এক প্রস্তাব পেশ করেন, ক্রুসেডাররা দিময়াত ছেড়ে চলে গেলে আলকুদসসহ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিজিত সব অঞ্চল তাদেরকে দিয়ে দেবন। তবে কামিলের একটি শর্ত ছিলো, কার্ক ও শোবাক অঞ্চল এর বাইরে থাকবে। এজন্য পোপের প্রতিনিধি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দরুন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

এমন অপমানকর প্রস্তাবের পরও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। পরাজয়ের মুখে ক্রুসেডাররা জান নিয়ে কোনোরকম বাড়ি যাওয়ার আকুতি জানায়। এভাবেই আল্লাহ সে সময় ফিলিস্তিনকে হেফাজত করেন।

৬২৪ হিজরীতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় সম্রাট ফেডারিকের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালিত হয়। মাত্র ৫০০ যোদ্ধা নিয়ে সে অভিযানে বের হয় তারা। দুর্বলচিত্তের শাসক দ্বিতীয় কামিল তাকে প্রস্তাব দেয়, যদি যুদ্ধ না করে সে ফিরে যায় তাহলে তাকে আলকুদস দিয়ে দেওয়া হবে। কামিল সত্যি সত্যিই ক্রুসেডারদের হাতে আলকুদস সোপর্দ করে। মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে ৬২৫ হিজরী/১২৩৮ ঈসাদে ফেডারিক আলকুদস বুঝে নেয়। তবে কামিল একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিল আলকুদস সাখরা ও আলআকসা মসজিদ তাদেরকে দেওয়া হবে না। কামিল ৬১৫-৬৩৫ হিজরী পর্যন্ত ২০ বছর শাসন করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কুদস বিজয়ের ৪৩ বছর পর এই পতনের ঘটনা ঘটে। ৬৩৭ হিজরী/১২৩৯ ঈসাদে নাজমুদ্দীন আইয়ুব শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নেককার শাসক। তিনি সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজান। এসময় নাজমুদ্দীনের ভাতিজা ইসমাইল দামেশকের ক্ষমতায় বসেন। সে ক্ষমতার জন্য হেন কোনো কাজ নেই করেনি। মিশর দখল করতে সে ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলায়।

৬৩৭ হিজরীতে নাসির দাউদ নিজস্ব বাহিনী নিয়ে আলকুদসে অভিযান চালান। তার এ অভিযান ইসলামের টানে ছিলো না। সে শুধু নিজের সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিল। সে ক্রুসেডারদের হাত থেকে আলকুদস ছিনিয়ে আনে। দ্বিতীয় কামিলের আলকুদস দিয়ে দেওয়ার ১১ বছর পর আবার ক্রুসেড শাসনের অবসান ঘটে। দাউদ আলকুদস দখল করতেই ইসমাইল এসে হাজির হয়। সে আলকুদস তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিতে চায়। বিনিময়ে সে পাবে মিশর দখলে ক্রুসেডারদের সহায়তা। এমনকি সে মসজিদে আকসা ও কুদস সাখরাও দিয়ে দিতে রাজি হয়। ৬৩৮ হিজরী/১২৪০ ঈসাদে দ্বিতীয় বারের মতো আলকুদস ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ুব ৬৪২ হিজরী/১২৪৪ ঈসাদে আলকুদস পুনরুদ্ধার করেন। এরপর থেকে ৬৯৩ বছর প্রায় সাত শতাব্দী ধরে আলকুদসে ইসলামী শাসন চালু থাকে। ১৩৩৫ হিজরী/১৯১৭ ঈসাদে ব্রিটিশ-বাহিনীর আলকুদসে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সেই ধারার অবসান ঘটে।

নাজমুদ্দীন আইয়ুবের কুদস জয়ের কথা শুনে ফরাসি সম্রাট নবম লুইসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক পোপ সপ্তম ক্রুসেডের ডাক দেন। ২ মুহাররম ৬৮৪ হিজরী/ ১২৫০ ঈসাদে ফারিস্কুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্রুসেডাররা চরমভাবে পরাজিত হয়। বন্দি হয় নবম লুইস। ক্রুসেডারদের প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য নিহত হয়।

নাজমুদ্দীন আইয়ুবের মৃত্যুর পর নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মিশরের ক্ষমতায় আসে মামলুকেরা। মামলুকদের শ্রেষ্ঠ শাসক সাইফুদ্দীন কুতুয মুসলিম বিশ্বের জন্য তাতারীদের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। ৬৫৪ হিজরী/১২৬০ ঈসাদে গাজায় মোতায়েন করা তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি তাতারদের আইনুল জালুতের যুদ্ধে টেনে আনেন। ২৫ রমযান ৬৫৮ হিজরীতে আইনুল জালুতের প্রান্তরে মুসলমানরা ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে।

সাইফুদ্দীন কুতুযের পর ক্ষমতা লাভ করেন যহীরুদ্দীন বাইবার্স। চার বছরে শাসন-ক্ষমতা গোছানোর পর ৬৬৩ হিজরীতে ক্রুসেডারদের দিকে মনোযোগ দেন। একসাথে তিনি একাধিক ক্রুসেড সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

এরপর ক্ষমতায় আসেন সাইফুদ্দীন কালান। তিনিও ক্রুসেডারদের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ৬৮৮ হিজরীতে তিনি ক্রুসেড রাজ্য তারাবলুস জয় করেন। ৬৮৯ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। শাসন-ক্ষমতায় আসেন তাঁর পুত্র আশরাফ খলীল। তিনি মুসলিম বিশ্বে গড়ে ওঠা অবশিষ্ট ক্রুসেডারদেরও উচ্ছেদ করেন। মুসলমান শাসনাধীনে ইহুদীরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। যে সময়টাতে ৬৯০ হিজরী/১২৯০ ঈসাদে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড ইহুদীদের দেশ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। এর এক বছর পর ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফিলিপ ইহুদীদের ফ্রান্স ছাড়তে বিল পাশ করেন। তবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে ছিলো ভিন্ন কথা। তখন দলে দলে ইহুদীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তাদের এ ধর্মান্তরণ ছিলো কেবলই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য। এদের মাধ্যমেই জন্ম নেয় খ্রিস্টীয় জায়নবাদের।

মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থান হতে থাকে। উসমান ইবনে আরতুগ্রলের হাত ধরে এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা মিলিয়ে ৬৪৩ বছর এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়। ৯২২ হিজরী/১৫১৬ ঈসাদে মার্জ দাবিক ময়দানে উসমানী ও মামলুক বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উসমানী সুলতান প্রথম সেলিম বিজয়ী হন। মামলুক বাহিনী পর্যদুস্ত হয়। এ বিজয়ের পর সুলতান সেলিম একে একে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন জয় করে নেন। এরপর মামলুকদের শেষ আশ্রয় মিশরও দখল করেন।

ইহুদীদের অবান্তর দাবির সূচনা

ইউরোপ থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উসমানী খেলাফতে। দীর্ঘকাল তারা সেখানে বসবাস করে। ১০৩৫ হিজরী/১৬৩০ ঈসাদে ‘সাব্বাতাই জেভি’ নামে এক ইহুদীর জন্ম হয়। সে নিজেকে মাসীহ দাবি করে। তার পাশে ইহুদী-খ্রিস্টানরা জড়ো হতে থাকে। সে দুনিয়াকে ৩৮ ভাগে বিভক্ত করে ইহুদীদের ভাগ করে দেয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী করে- খুব শিগগির তারা আপন আপন অঞ্চলের সম্রাট হয়ে যাবে। সে একসময় উসমানী সাম্রাজ্য থেকে তার

নিজের বণ্টন করা এলাকাগুলো দাবি করে বসে। এজন্য সে কিছু প্রতিবাদ সমাবেশ করে। প্রথম প্রথম প্রশাসন তাকে পাগল মনে করে এড়িয়ে গিয়েছিল। একপর্যায়ে তার দৃঢ়তা দেখে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগ মুহূর্তে সে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। সে ইহুদীদেরকেও ইসলাম গ্রহণ করতে বলে। তারা মুসলিমের ছদ্মবেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেয়। ইউরোপে তারা যেমন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ক্যাথলিক গির্জায় ঢুকে পড়ে, তেমনি উসমানী সাম্রাজ্যেও একই কাজ করে। তারা ডোনমে (ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন) আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা সেনাবাহিনীর উঁচু উঁচু পদগুলোতে ঢুকে পড়ে। তারা ‘ঐক্য ও প্রগতি সংঘ’ ঢুকে পড়ে। খেলাফত পতনে যাদের বড় ভূমিকা ছিলো।

১৭৯৮-৯৯ সালে নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট মিশর অভিযান চালান। আক্কার প্রাচীর অবরোধকালে তিনি ইহুদীদের এখানে এসে জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। ফরাসিরা প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়ার কারণে ক্যাথলিক ইংল্যান্ড ও রাশিয়া বিচলিত হয়ে পড়ে। উসমানী খেলাফতও নেপোলিয়নের কারণে বিচলিত ছিলো। ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও উসমানী খেলাফত মিলে নেপোলিয়নকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। উসমানী খেলাফত মিশর উদ্ধারে মুহাম্মাদ আলী পাশাকে সেনাপতি করে পাঠায়। সে নিজের সাম্রাজ্য গড়ার লোভে সে ব্রিটিশদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনামলে ফিলিস্তিনীরা চরম দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। ফিলিস্তিনীদের ওপর মোটা অংকের করারোপ করা হয়। ফিলিস্তিনীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ব্রিটিশরা মুহাম্মাদ আলীর কাছে ফিলিস্তিনে একজন কনসাল নিয়োগের দাবি জানায়। এই কনসালের কাছে ব্রিটিশ রাজার প্রথম বার্তা ছিলো, ‘ইহুদীদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’ ফিলিস্তিনের ঘটনাপ্রবাহে এই কনসালের অনেক ভূমিকা রয়েছে।

খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলের শুরুতে (১২৯৩-১৩২৮ হিজরী/ ১৮৭৪-১৯০৯ ঈসাদ পর্যন্ত) রাশিয়ায় চরম ইহুদী নির্যাতন হয়। তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সুলতান আব্দুল হামীদকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের গ্রহণ করতে বাধ্য করে। নানা কারণে তিনি ইহুদীদের মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে তিনি এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন যে, ইহুদীরা কিছুতেই ফিলিস্তিনে বসবাস করতে পারবে না।

তবে একপর্যায়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হস্তক্ষেপ শুরু করে। তখন সুলতান আব্দুল হামীদ সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেন, ‘যতদিন উসমানী খেলাফত থাকবে, ততদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ঠাই পাবে না।’

১২৯৯ হিজরী/১৮৮২ ঈসাব্দে ব্রিটেন মিশর দখল করে নেয়। ফিলিস্তিন থেকে মিশরকে আলাদা করে ফেলে। খলীফা আব্দুল হামীদের আমলেই ‘তুর্কী যুব সংঘ’ গড়ে ওঠে। যারা ছিলো ফরাসি বিপ্লবের চেতনায় উজ্জীবিত। তারা ছিলো ধর্মহীন। লালন করত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা। ‘ঐক্য ও প্রগতি’ নামে তাদের ছিলো সামরিক ফ্রন্ট। উসমানী সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। ডোনমে ইহুদীরাও তাদের সমর্থন দেয়। আরব বিশ্বেও তখন জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। সেইসাথে হার্জেল নামক এক ইহুদী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কাছে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য লবিং করতে থাকে। সে সুলতান আব্দুল হামীদের কাছেও গিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জমি দেওয়ার আবেদন করে। সুলতানকে অনেক প্রলোভনও দেখায়। সুলতান আব্দুল হামীদ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। সে রুশ সশাট জারের কাছে গিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে সে উসমানী খেলাফত ও রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়ার ফন্দি আঁটতে থাকে।

পতনের সূচনা

১৯০৯ সালে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ সুলতান আব্দুল হামীদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। নামকাওয়াস্তে খলীফার আসনে বসানো হয় পঞ্চম মুহাম্মাদকে। ব্যক্তিত্বহীন এ মানুষটি ছিলো কেবলই খেলাফত বিলুপ্তির মাধ্যম। তার মন্ত্রীসভার ১৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৩ জনই ছিলো ইহুদী। মন্ত্রীসভায় ইহুদীদের উপস্থিতির কারণে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। এ অসন্তোষ কঠোর হাতে দমন করা হয়।

১৯১৪-১৯১৮ ঈসাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐক্য ও প্রগতি সংঘ উসমানী খেলাফতকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। পরিকল্পিতভাবে জার্মানির পক্ষে দাঁড় করায়। এসময় ইউরোপে থাকা উসমানী সেনাবাহিনীতে মড়ক দেখা দেয়। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে এ বাহিনী একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। তখনো ফিলিস্তিনে উসমানী বাহিনীর ১ লাখ সৈন্য মোতায়েন ছিলো। এতে বোঝা যায়, উসমানী খেলাফত ফিলিস্তিনকে কতটা গুরুত্ব দিত। দুঃখের বিষয় হল, এ বিপুল সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলো মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, যার হাতে ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফতের পতন ঘটে।

ব্রিটিশরা শরীফ হুসাইনকে খুঁজে বের করে আরব ও তুর্কীদের মুখোমুখি করতে। ১৯১৫ সালে মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ম্যাকমোহন ও শরীফের মাঝে চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক শরীফ হুসাইন উসমানীদের অধীনে থাকা আকাবা বন্দর দখল করে নেবে, যেন ব্রিটিশদের ফিলিস্তিনে প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। ৩০ রজব ১৩৩৪/১ জুলাই ১৯১৬ সালে শরীফ আরব বিপ্লব কায়ম করেন। তার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলো ছেলে ফয়সাল। সঙ্গে ছিলো ইহুদী সামরিক অফিসার আরব লরেন্স। আরব-বাহিনী আকাবা বন্দর দখল করার মাধ্যমে ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন প্রবেশের পথ সুগম হয়ে যায়।

১৯১৭ সাল ছিলো মুসলমানদের জন্য চরম বিপর্যয়ের। ২৫ অক্টোবর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সাত সদস্যের বিপ্লবী পরিষদের প্রধান লেলিন ছিলো ইহুদী কার্ল মার্ক্সের আদর্শ লালনকারী। বাকি চারজন ছিলো ইহুদী। পরিষদের সদস্য স্টালিন ইহুদী না হলেও তার স্ত্রী ছিলো ইহুদী। বাকি একজন ছিলো খ্রিস্টান। তাদের গঠন করা মন্ত্রী পরিষদের ২২ জনের ১৭ জনই ছিলো ইহুদী। এ ছিলো হার্জেলের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এর এক সপ্তাহ পর আসে বেলফোর ঘোষণা। ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে নিয়োজিত উসমানী সালতানাতের সেনাপতি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে ফিলিস্তিন থেকে সরে যাওয়ার বিনিময়ে তুরস্কের সিংহাসনে বসানোর প্রলোভন দেয়। মুস্তফা কামাল সেই প্রলোভন ভালো করেই গলাধঃকরণ করে। এই বছরের ১৬ নভেম্বর বেলফোর ঘোষণার দুই সপ্তাহ পর ব্রিটিশ-বাহিনী ফিলিস্তিন দখল করে। কথামতে কামাল তুর্কী বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে। আরব-বাহিনী ছিলো ব্রিটিশদের সহায়ক। তখন ফিলিস্তিনের বিপুল জনগোষ্ঠী কোথায় ছিল? আফসোস, তখন তারাও আরব জাতীয়তাবাদে বঁদু হয়ে ছিলো। তাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল, ব্রিটিশরা এসে তাদেরকে উসমানীদের হাত থেকে রক্ষা করবে! তখন ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, ‘ইসলামী খ্রিস্টীয় যুব সংঘ’। ফিলিস্তিনীদের মগজ ধোলাইয়ে এদেরও জঘন্য ভূমিকা ছিলো। এদের কাছে অনেকেই তখন প্রতারিত হয়েছিল।

ইহুদীকরণ প্রকল্পের সূচনা

এরপর ১৯১৮-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে চলে ইহুদীকরণ প্রকল্প। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ছিলো ৮%। ১৯৪৮ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৩২%। তারা নানা ছলচাতুরি, প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জমি ক্রয় করতে শুরু করে। এত কিছু পরও ইহুদীরা কেবল ১% জমি ক্রয় করতে পেরেছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনের অর্থনীতিতে মারাত্মক আধিপত্য বিস্তার করে।

ফিলিস্তিনীদের মুক্তি-সংগ্রাম

ফিলিস্তিনীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র উভয় উপায়েই সংগ্রাম করেছে। স্বভাবতই প্রথম ধারার সংগ্রাম হয় ফলাফলশূন্য। শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ছিলো ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত। ১৯৩৩ সালে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র জিহাদের সূচনা হয়। নেতৃত্ব দেন সিরিয়ান নাগরিক ইযযুদ্দীন কাসসাম রহ.। যার নামে গঠিত হয়েছে কাসসাম ব্রিগেড। এই জিহাদী কাফেলা দীর্ঘদিন গোপনে সুসংগঠিত হয়। তারপর সামরিক অভিযান শুরু করে। ইযযুদ্দীন কাসসাম রহ.-এর শাহাদাতের পর নেতৃত্বে আসেন ফারহান সাদী। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। রোযা অবস্থায় তিনি শহীদ হন। এই মুজাহিদ বাহিনী ১৯৩৬ সালে ৫০৬টি কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৩৮ সালে করে ৫৭০৮টি। ১৯৩৯ সালে করে ৩৩১৫টি। ৩৭ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত

মুজাহিদদের হাতে ১০ হাজার ব্রিটিশ সেনা প্রাণ হারায়। ফিলিস্তিনী শহীদ হন ১২ হাজার। বন্দি হয় ৫০ হাজার। এমন প্রতিরোধের মুখে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন দুই ভাগ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ওয়াদা দেয়। এ ওয়াদা ছিলো শুধুই প্রতারণা। এ ওয়াদায় প্রতারণিত হয় মুসলমানেরা। স্তিমিত হয়ে যায় জিহাদী আন্দোলন।

ইহুদীকরণ প্রকল্পের দ্বিতীয় স্তর

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদী নির্যাতনের অজুহাতে ফিলিস্তিন অভিমুখে আবার ইহুদীদের ঢল নামে। এসময় ৯০ হাজারেরও বেশি ইহুদী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। মানুষের সহানুভূতি কুড়াতে তারা হলোকাস্টের গল্প প্রচার করে। তারা দাবি করে, হিটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করেছে। অথচ ইহুদীদের মোট সংখ্যাই তখন ওই পর্যন্ত গড়ায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো রাষ্ট্র না থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা জাতিসংঘে নিজেদের নামে প্রতিরক্ষা ইউনিট তৈরি করে।

এদিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলে আমেরিকা পরাশক্তি হিসেবে উত্থানের জানান দেয়। গ্রেট ব্রিটেনের সূর্য তখন অস্তগামী। ইহুদীরা এ সময়ে ব্রিটেনকে ত্যাগ করে আমেরিকার কোলে আশ্রয় নেয়। ব্রিটেনকে ত্যাগ করতে গিয়ে ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব খেয়ানতেরই পরিচয় দেয়। ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন জোট গঠিত হয়। তারা তিনটি দাবি উত্থাপন করে : ১. এক লক্ষ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় দিতে হবে। ২. ফিলিস্তিনে সবার জন্য জমি কেনা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। ৩. ফিলিস্তিনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করতে হবে।

একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু

আরবদের প্রতিবাদের মুখে বিষয়টি জাতিসংঘের দায়িত্বে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ দুই রাষ্ট্রের প্রস্তাব দেয়। ইহুদীরা ৩২% হয়েও তারা পাবে ফিলিস্তিনের ৫৬.৫% পার্সেন্ট, ফিলিস্তিনিরা পাবে ৪৩%। বাকি ০.৫% আলকুদস ভূখণ্ড। যা আন্তর্জাতিক অঞ্চল। ১৯৪৭ সালে বিভক্তির এ প্রস্তাব কার্যকর হয়। আরব লীগ দ্রুত বৈঠকে বসে। কয়েকটি আরব দেশ মিলে স্যালভেশন আর্মি গঠন করে। নেতৃত্ব দেওয়া হয় সন্দেহজনক এক ব্যক্তি ফাওজী কাউকজীকে। এক মিলিয়ন পাউন্ড বাজেট করা হয়। দামেশকের কাতনায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়।

এ সংবাদ শুনে ব্রিটেন আরবলীগের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠায়, ‘ফিলিস্তিনীদের প্রশিক্ষণ, সশস্ত্রীকরণ ব্রিটেন বন্ধুত্ব পরিপন্থি মনে করে।’ এতেই আরবলীগ ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের বের করে দেয়। স্যালভেশন আর্মির সংখ্যা ৭৭০০ তে নামিয়ে আনে। অথচ ইহুদী সশস্ত্র সংগঠন এক হাগানারই

সদস্য সংখ্যা ছিলো তখন ৬২ হাজার! আরবলীগের এমন সিদ্ধান্তে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ১৯৪৫ সালে আরবলীগের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ব্রিটেনের ইচ্ছা।

তখন আব্দুল কাদের হুসাইনীর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আন্দোলন মুসলিম বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলো ব্রিটিশ আগ্রাসনের মুখে থাকার দরুন আন্দোলন তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। কেবলমাত্র ইখওয়ানুল মুসলিমীন সক্রিয়ভাবে ফিলিস্তিন জিহাদে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল আলকাস্তাল শহর অবরোধের সময় আরবলীগের কাছে অস্ত্র চাওয়া হলে কোনো সাড়া মেলেনি। ব্রিটিশ-বাহিনী ফিলিস্তিন ছাড়ার আগ পর্যন্ত আরব-বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর একের পর এক শহর ইহুদীদের হাতে পতন হতে থাকে। ১৫ জুলাই ১৯৪৮ সালে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৬ দিনের মাথায় জাতিসংঘ শান্তির আহ্বান জানায়। আরব দেশগুলো প্রতারণাপূর্ণ শান্তি প্রস্তাবের ফাঁদে পা দেয়। ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ইহুদীদের অনুকূলে চলে যায়।

আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা

ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আসেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফোক বার্নার্ডট। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরলে ১৭ সেপ্টেম্বর ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে। আরব-বাহিনী মুজাহিদদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে পৌঁছতেই নিরাপত্তাবাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে। আরব-বাহিনী সেসব এলাকাতেই অভিযান চালায়, যেগুলো জাতিসংঘ ইসরাইলের ভাগে দিয়েছিল। আরব-বাহিনী সেসব এলাকা থেকে মুজাহিদদের হটিয়ে ইহুদীদের জন্য দখল করার পথ সুগম করে দিত। ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ফিলিস্তিনীকে বিভিন্ন আরব দেশে বিতাড়িত করা হয়। ইখওয়ানের প্রধান হাসানুল বান্নাকে গুলুঘাতকের মাধ্যমে শহীদ করা হয়। এভাবেই আরব-ইসরাইল যুদ্ধবিরতির আয়োজন করা হয়। ১৯৪৯ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইহুদীরা মিশরের সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে। ২৩ মার্চ লেবাননের সাথে চুক্তি হয়। ৪ এপ্রিল হয় জর্ডানের সাথে। সিরিয়ার সাথে চুক্তি হয় একই বছরের ১ এপ্রিলের পরে। ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ২২% ভূখণ্ড মিশর ও জর্ডানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। জর্ডানের ভাগে যায় পশ্চিম তীর। গাজায় আধিপত্য বিস্তার করে মিশর। আরব-ইসরাইলের এ সন্ধির পর জাতিসংঘ ইসরাইলকে সদস্যপদ দেয়। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ একের পর এক জায়নবাদী এ রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিতে থাকে।

প্রিয় পাঠক, এতকিছুর পরও ফিলিস্তিন শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্বাসঘাতকতার এমন পটভূমিতেই শুরু হয় মুনাফিক পরিবেষ্টিত ফিলিস্তিনীদের নিঃসঙ্গ মুক্তি-সংগ্রামের

নতুন অধ্যায়। ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ আন্দোলন শুরু হয়। গঠিত হয় পিএলও। ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে ইয়াসির আরাফাত ছিটকে যান জিহাদ ও সংগ্রামের ধারা থেকে। শেখ আহমাদ ইয়াসীনের নেতৃত্বে গঠিত হয় হামাস। হামাসের নেতৃত্বে ইনতিফাদা ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনবাসী দিয়ে যাচ্ছে জিহাদ ও শাহাদাতের অন্তহীন নাজরানা। যা আজ বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দেখছে।

[তথ্যসূত্র: কাসাসুল কুরআন; হিফজুর রহমান সিহারবী রহ., কিসসাতু ফিলিস্তিন; রাগিব সারজানি, আকসা কে আসু; আবু লুবাবা শাহ মানসূর, আলজাজিরা, উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য]

মাসিক আলকাউসার, রবিউল আখির ১৪৪৫। নভেম্বর ২০২৩

হাদীসের আলোকে প্রকৃত রোযা

মুফতী হাফিজুর রহমান*

রোযা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ঢাল স্বরূপ

১। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

রোযা হলো ঢাল সদৃশ। যদি তোমাদের কেউ রোযা থাকে সে যেন অন্যায় অশ্লীল কাজ না করে এবং মূর্খতাসুলভ আচরণ না করে। কেউ যদি তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় বা বকা দেয় তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার। -সহীহ বুখারী; হাদীস ১৮৫৬

২। হযরত আবু উবাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

রোযা হলো ঢাল স্বরূপ; যতক্ষণ না একে রোযাদার (গোনাহ করে) ভেঙ্গে ফেলে। -সুনানে নাসাঈ; হাদীস ২২৩২, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৬৯০

মিথ্যাচার রোযা কবুলের অন্তরায়

* আমীনুত তা'লীম, মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, সাবেদ আলী মোল্লা জামে মসজিদ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে ব্যক্তি মিথ্যা, মিথ্যাকর্ম ও অজ্ঞতাসুলভ আচরণ পরিত্যাগ করলো না তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।
-সহীহ বুখারী; হাদীস ১৮৬৫, সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২৩৬২

রোযা যেন নিছক অনাহারই না হয়

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

অনেক রোযাদার এমন রয়েছে যাদের রোযার মাধ্যমে অনাহারে থাকা ও তৃষ্ণার্ত থাকা ছাড়া তাদের কিছুই লাভ হয় না। -সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৩৪৭২, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৫৭১

রোযা রেখে বিনা কারণে ভেঙ্গে ফেলার মর্মস্ফুট শাস্তি

হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এলো। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, তখন হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এসব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত বরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হলো যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে। -সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস ১৯৮৬, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৭৪৪৮, সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ৩২৮৬, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৬০৯

রোযা রেখে বিনা কারণে ভেঙ্গে ফেলার ক্ষতি

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমায়ানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার

হক আদায় হবে না। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৯৮৯৩, মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক; হাদীস ৭৪৭৬

২। হযরত আলী রাযি. বলেন,

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমায়ান মাসের একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৯৮৭৮

রোযাদারকে ইফতার করানোর প্রতিদান

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। তবে রোযাদারের সওয়াব হতে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। -সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৮০৭, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৭০৩৩

খেজুর দ্বারা ইফতার করবে, তা না হলে পানি দ্বারা ইফতার করবে

হযরত সালমান বিন আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

তোমাদের কেউ যখন ইফতার করবে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কারণ খেজুর বরকতময় খাদ্য। যদি সে খেজুর না পায় তবে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কারণ পানি হলো পবিত্র পানীয়। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২৩৫৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৬৯৫

সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করুন

১। হযরত সাহল বিন সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

মানুষ যতদিন সময় হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মাঝে থাকবে। -সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০৯৮, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৬৯৯

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

সকল নবীকে সময় হওয়ার পরপরই দ্রুত ইফতার করতে এবং সাহরী শেষ সময়ে খেতে আদেশ করা হয়েছে। -আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানী; হাদীস ১৮৮৪, মাজমাউয যাওয়াইদ; হাদীস ২৬০৯

ইফতার করে এ দু'আ পড়বে

প্রাত্যহ্ন একাদশ সংকলন, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪

১। হযরত মু'আয ইবনে যুহরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন-

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার দেয়া আহাৰ্য দ্বারাই ইফতার করলাম। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২৩৫৮

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

ইফতারের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আটি পড়তেন-

دَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْثُ وَنَبَتَ الْأُجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থ : পিপাসা দূরভিত হলো, শিরা-উপশিরা সতেজ হলো। আর আল্লাহ তা'আলা যদি চান তাহলে রোযার সওয়াব লিপিবদ্ধ হলো। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২৩৫৭, মুসনাদদরাকে হাকেম; হাদীস ১৫৭৬

সাহরী বরকতময় খাদ্য

হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা সাহরী খাও; কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে। -সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০৯৫, সহীহ বুখারী; হাদীস ১৮৮৮

বিলম্বে সাহরী খাওয়া সুন্নাত

১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি আমার পরিবারের সাথে সাহরী খেতাম। এরপর দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে শরীক হতাম। -সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯২০

২। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহরী খেতাম। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফজরের আযান ও সাহরীর মাঝে কী পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হতো? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আযাত পাঠ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হতো। -সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯২১

এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহরী করো

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

সাহরী খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ করো না। এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহরী করো। কারণ যারা সাহরী খায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দু'আ করেন। -মুসনাদে আহমদ ৩/১২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৯০১০, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৩৪৭৬

সাহরী খাওয়া ইহুদী-খ্রিস্টানদের রোযা ও মুসলিমদের রোযার মাঝে ব্যবধান তৈরি করে

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া (আমরা সাহরী খাই; তারা খায় না)। -সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০৯৬

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মাওলানা সাঈদুর রহমান*

ইসলামী রাষ্ট্র আসলে পত্র ও শাখাপল্লবিত বিরাট এক ছেয়ে যাওয়া বৃক্ষ। হঠাৎ করেই যা গজিয়ে ওঠে না। হঠাৎ করেই বেড়ে ওঠে না। এর জন্য জমি কর্ষণ করতে হয়, বীজ রোপন করতে হয়, নিয়মিত পানি, সার ও কীটনাশক দিতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে একদিন তা বিরাট বৃক্ষ হয়ে পত্রপল্লবিত হয়। অতঃপর দর্শককে মোহিত করে, পথিককে ছায়া দেয়, পড়শীকে অগ্নিজন দেয়, ফুল দেয় ফল দেয়। সবাইকে ভরপুর করে দেয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রকে কল্পনা করা অলিক কল্পনা। আজকে এই প্রবন্ধে আমরা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়ার কথা থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হয়ে ওঠার ধারাবাহিক একটি চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়ার কথা

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া মৌলিকভাবে প্রোথিত আছে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিন বছরের গোপন দাওয়াত অতঃপর প্রকাশ্য দাওয়াতী কার্যক্রমের মাঝে।

তখন থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে, হযরত খাব্বাব রাযি. মুশরিকদের অত্যাচারে ভারাক্রান্ত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ নিয়ে আসেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ ও সাহায্য চাওয়ার অনুরোধ করেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই অবশ্যই এই দীনকে পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছাবেন, এমনকি কোনো ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহন করে (ইয়ামানের) সানআ থেকে হাজারামওত এমন অবস্থায় সফর করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় করবে না। -হাদীস নম্বর

৩৮৫২

হযরত আমর বিন আবাসা সুলামী রাযি. যখন মক্কার সেই কঠিন সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য হাজির হন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, যখন তুমি শুনবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি তখন (আবার) আমার নিকট আসবে। ঠিকই তিনি পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজয়ের সংবাদ শুনে মদীনায় এসে হাজির হয়েছিলেন। -সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৩২

মক্কায় অবস্থানের সময় থেকেই এরকম বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অহী থেকে প্রাপ্ত অটল বিশ্বাস ও এই দাওয়াতের প্রতি দৃঢ়চিত্ততার অনমনীয় প্রকাশ ছিলো।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিবিড় দাওয়াতি কার্যক্রম ও সুদৃঢ় লক্ষ্যে স্থির থাকার প্রয়োজনীয়তা

আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি, ইসলামী রাষ্ট্র হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সম্ভব না। এর জন্য অত্যাব্যশ্যক হলো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আদর্শ এবং নিবিড় দাওয়াতি কার্যক্রম। একদল একনিষ্ঠ, বিশ্বাসী এবং ত্যাগী আদর্শবাদী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছরের গোপন দাওয়াতি কার্যক্রমে এই মৌলিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন। তারপর প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তখন মুসলমানদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। এই সময় জরুরী ছিলো দাওয়াতী কার্যক্রমকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। একারণে মক্কার নিবিড় দাওয়াতী কার্যক্রমের সময়কালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধৈর্য ও

* মুদাররিস, মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

ক্ষমার পত্নী অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সূরা যুখরুফের ৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

অতএব আপনি তাদেরকে অগ্রাহ্য করুন এবং বলুন, 'সালাম'।

অচিরেই তারা জানতে পারবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. বলেন,

আপনি মুশরিকদের এড়িয়ে যান এবং বলুন 'সালাম'। অর্থাৎ তাদের কট্টকথার জবাবে কট্টকথা বলবেন না, বরং সৌজন্য বজায় রাখুন, কথায় বা কাজে তাদের প্রত্যুত্তর করবেন না। অচিরেই তারা জানতে পারবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ধর্মিক। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা (পরবর্তীতে) তাদের উপর অপ্রতিরোধ্য শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন। আর আপন দীন ও কালিমা সুউচ্চ করেছিলেন। আর জিহাদ ও লড়াইয়ের বিধান অবতীর্ণ করেছিলেন, এমনকি লোকেরা দলে দলে দীন ইসলামে দাখিল হয়েছে এবং পূর্ব-পশ্চিমে ইসলাম ছড়িয়ে গেছে।

এ-তো গেলো মক্কায় থাকা অবস্থার কথা, এমনকি মদীনায় যাওয়ার পরও মদীনার আহলে কিতাবদের সাথে ক্ষমা ও উপেক্ষার নির্দেশনা ছিলো একটি মেয়াদ পর্যন্ত। সূরা বাকারার ১০৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

অর্থ : তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষা করো, এমনকি আল্লাহ তা'আলা নিজ ফায়সালা পাঠিয়ে দেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর রহ. তাফসীরে ইবনু আবী হাতিমের সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন,

হযরত উসামা ইবনু যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের ক্ষমা করতেন যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা তাদের দেওয়া কষ্টে সবর করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষা করো, এমনকি আল্লাহ তা'আলা নিজ ফায়সালা পাঠিয়ে দেন।' -সূরা বাকারার আয়াত ১০৯। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ক্ষমার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সর্দারদের বেশ কতককে হত্যা করেন। (হাফেয ইবনু কাসীর রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ।)

এভাবে এই নিবিড় দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বিশ্বাসী ও ত্যাগী কিছু মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা পরবর্তীতে ইসলামের আদর্শ ও ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সাব্যস্ত হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.-এর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘর শক্তি সঞ্চয়ের প্রথম সূতিকাগার
মুসলমানগণের সংখ্যা যখন ৩৮, তখন হযরত আবু বকর রাযি.-এর আবেদনে কাবার কাছে হাজির হন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে বাকি মুসলমানগণ নিজ নিজ গোত্রের সাথে অবস্থান নেন। তখন আবু বকর রাযি. প্রকাশ্যে ভাষণ দেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। এর ফলাফল হয় ভয়ানক। তখন কুরাইশের মুশরিকরা হযরত আবু বকর রাযি.-কে এমনভাবে মারপিট করে যে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে যান। এই ঘটনার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম রাযি.-এর ঘরে অবস্থান নেন। সেখানে গোপনীয়তার সাথে মুসলমানগণ ইবাদত করতেন। সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর মুসলমানগণ সেখান থেকে বের হন। -সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ২/৩১৯। 'দারুল আরকাম' সাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। মুসলমানদের শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম সূতিকাগার ছিলো এটি।

হিজরতের পরম্পরা, শক্তি সংরক্ষণের শক্তিশালী পন্থা

শক্তি সংরক্ষণ এবং সদ্যোদ্যত চারাকে টিকিয়ে রাখতে হিজরত বা নিরাপদ ভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হিজরত কোনো আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ধাপ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনায় সাহাবায়ে কেরাম কয়েকবার হিজরত করেন। নবুওয়তের পঞ্চম বছর রজব মাসে মোট পনের জন মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন। তখন পর্যন্ত ইয়াসরিব/মদীনা হিজরতের জন্য উপযোগী ভূমি ছিলো না। কারণ ইয়াসরিবের অধিবাসী আউস ও খায়রাজ গোত্র মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলো না। তাছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যে তখন রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিল। এসব বিবেচনায় হাবশা ছিলো তুলনামূলক নিরাপদ ভূমি। হাবশায় প্রথম হিজরতের ক'মাস পর হযরত উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী ও দাপুটে হযরত উমর রাযি.-এর ইসলামগ্রহণ ছিলো ইসলামের একটি ছোটখাটো বিজয়ের মত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলতেন,

আমরা হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের আগে কা'বার নিকট নামায পড়তে পারতাম না। -সীরাতে ইবনে হিশাম

১/৩৪২

হযরত উমর রাযি.-এর কিছু দিন আগে হযরত হামযা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উভয়ের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল বেশ। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত হয়। এবার একশ'র বেশি মুসলমান হিজরত করেন। হাবশায় মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ও নিরাপদ অবস্থান কুরাইশরা সহ্য করতে পারছিল না। তারা হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে গিয়ে তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে। তখন বাদশাহর সামনে হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব রাযি.-এর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যে বাদশাহ মুগ্ধ হন এবং মুসলমানদের নিরাপত্তাদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এটা ছিলো ভিনদেশে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য। পরবর্তীতে মুসলমানগণ নাজাশীর হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক সময় বাদশাহ নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাবশায় মুসলমানদের কৌশলগত ভূমিকা থেকে একটি উদীয়মান শক্তির প্রতিকূল পরিবেশে করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট শিক্ষা পাওয়া যায়। সে সাথে অমুসলিম সমাজে মুসলমানদের নিরাপত্তার সাথে বসবাসের বিষয়ে ইসলামের কর্মপন্থারও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্বের সময় বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম উপস্থাপন এবং দাওয়াতের পৃষ্ঠপোষকের আহ্বান

নবুওয়াতের তিন বছর পর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি হজ্বের মওসুমগুলোতে ওকায়, মাজান্নাহ, যুল মাজায় বাজারে ও মিনার জমায়েতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সেখানে পুরো আরব থেকে আসা পূণ্যার্থীদের কাছে ইসলামের মূল বাণী তুলে ধরতেন। সেই সাথে তাদের কাছে এই দাওয়াতের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার প্রস্তাব করতেন। বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাতের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দিতেন। -মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৪৪৫৬, সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৪৭৩৪, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯২৫

নবুওয়াতের দশ বছর পর্যন্ত এই সুমহান ফযীলতের প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করেনি। এই প্রস্তাব ও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তিনি মক্কা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে তায়েফে গমন করেছিলেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত ও প্রস্তাব কবুল করা দূরে থাক; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়ে বিদায় দিয়েছিল। কে

জানত যে, আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ইয়াসরিববাসীর ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন।

তৎকালীন মদীনার প্রেক্ষাপট ও খোদায়ী ব্যবস্থাপনা

বান্দা যখন চেষ্টা চালিয়ে যায়, তখন পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত আসতে থাকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। অব্যাহতভাবে এই দাওয়াত চলছিল। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত অবতীর্ণ হলো। নবীজীর এই দাওয়াত ও দাওয়াতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রস্তাব কবুল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন আল্লাহ তা'আলা। নবুওয়াতের সপ্তম বছর ইয়াসরিবের প্রধান দুই গোত্র আউস ও খায়রাজের মাঝে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক 'বুআস' যুদ্ধ।

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

বুআসের যুদ্ধকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভূমিকাস্বরূপ (অনুকূল পরিস্থিতি প্রস্তুত করতে) সাব্যস্ত করেছিলেন। ফলে তিনি এমন পরিস্থিতিতে (মদীনায়) আগমন করেন যখন তাদের জমায়েত ছিল ভিন্ন, তাদের নেতারা নিহত আর তারা ক্ষতবিক্ষত। (মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, তাদের হৃদয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের [দাওয়াত কবুলের জন্য] কোমল হয়ে ছিল) এই ঘটনাকে আল্লাহ তা'আলা আপন রাসূলের (নুসরতের) জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ বানিয়েছিলেন। -সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৪৩২০

এই যুদ্ধে আউস ও খায়রাজের প্রবীণ নেতারা সব মারা যায়। খায়রাজের সর্দার আমর ইবনু নুমান, আউসের সর্দার হুজাইর উভয়েই এই যুদ্ধে মারা যায়। ফলে জাত্যাভিমান ও অহংকারবশত ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে এমন সকল নেতারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই পর্যায়ে নেতাদের মধ্যে একজন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল বেঁচে যায়। পরবর্তীতে যে ছিলো মুনাফিক সর্দার। (ফাতহুল বারী উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা, সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৩/১৩২) ফলে পরবর্তী নেতৃত্বে যারা আসেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন যুবক ও তরুণ। -মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৪৬৫৩। যাদের মধ্যে ইসলামের সুমহান দাওয়াত গ্রহণের জন্য উর্বর হৃদয় ছিলো। প্রথমত ইয়াসরিববাসীরা পরিকল্পনা করেছিল যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলকে নেতা মেনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিলো ভিন্নরকম।

মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ ও প্রথম বাইআতে আকাবা

বুআসের যুদ্ধের আগেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়াসরিববাসীকে ইসলামের দাওয়াত ও পৃষ্ঠপোষণের আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তখন ইয়াস বিন মুয়াজ নামে একজন অল্পবয়সের তরুণ ছাড়া অন্যরা সাড়া দেয়নি। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪২৭)

সীরাতে রচয়িতা ইমাম ইবনে ইসহাক রহ. বলেন,

যখন আব্বাহ তা'আলা চাইলেন আপন দীনকে বিজয়ী করতে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্যাদা দিতে ও তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করতে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বছর হজ্জের মওসুমে বের হলেন, যে বছর আনসারদের দলটির সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হয়েছিল। তখন তিনি নিজেকে আরবের গোত্রগুলোর সামনে সামনে উপস্থাপন করলেন দীনের সাহায্যের প্রস্তাবনা নিয়ে যেমনটি প্রতি বছর করতেন। এরই মধ্যে জামরায়ে আকাবার নিকট সাক্ষাত হলো ইয়াসরিববাসীর সেই দলটির সাথে, যাদের সাথে আব্বাহ কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪২৮

ইবনে ইসহাক রহ.-এর বিবরণমতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুশল বিনিময় করে তাঁদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামের সমর্থনের প্রস্তাবনা দিলেন। তখন তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন,

হে লোকসকল! নিশ্চিত জানো, আব্বাহর শপথ, ইনিই সেই নবী ইহুদীরা যার কথা বলে তোমাদের ভয় দেখায়। সুতরাং কিছুতেই ইহুদীরা যেন তোমাদের আগে তাঁকে পেয়ে না যায়। এই বলাবলি করে তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কবুল করে নিলেন। এবং বললেন, আমরা আমাদের গোত্রের বাকি লোকদের রেখে এসেছি। তাদের মত পরস্পর শত্রুতা ও অশান্তিতে আক্রান্ত আর কোনো গোত্র নেই। হয়তো আব্বাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে মিল করে দিবেন। আমরা তাদের নিকট যাব এবং তাদেরকে আপনার আনীত ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিব। এবং আপনার ডাকে যে দীনের প্রতি আমরা সাড়া দিয়েছি তা তাদের সামনে উপস্থাপন করব। যদি আব্বাহ এর উপর তাদেরকে একত্র করে দেন তাহলে আপনার যে অধিক মর্যাদাদাবান আর কেউ হবে না।

এরপর তারা ইয়াসরিবে ফিরে গেলেন। তারা ছিলেন ছয়জন, আসআদ বিন যুরারাহ, আউফ ইবনুল হারিস, রাফে' ইবনে মালেক, কুতবাহ ইবনু আমের,

উকবাহ ইবনু মালেক, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪২৯, ৪৩০

এটা ছিলো নবুওয়াতের দশম বছরের ঘটনা। ইয়াসরিবের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ নিজ এলাকায় গিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। দাওয়াতি কার্যক্রমের ফলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, ইয়াসরিবের এমন কোনো ঘর বাকি ছিলো না যেখানে একদল প্রকাশ্য মুসলমান ছিলেন না এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা হত না। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩০

এরপরের বছর আউস এবং খায়রাযের বার জন সদস্য হজ্জের মৌসুমে উপস্থিত হলেন। যেখানে হযরত আবু উমামা আসআদ ইবনু যুরারাহ, আউফ ইবনে হারেস, উবাদাহ ইবনু সামিত, মালেক ইবনু তাইয়িহান প্রমুখ ছিলেন। তাঁরা শিরিক পরিহার; চুরি, যিনা, সন্তান হত্যা, অপবাদ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাদ্য হবেন না মর্মে বাইআত নিলেন। এটাকে প্রথম বাইআতে আকাবাহ বলা হয়। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৪, সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৮৯২

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.-এর মাদরাসা হিজরতের ভূমির শক্ত ভিত প্রথম আকাবার বাইআতের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসরিবের মুসলমানদের কুরআন, ইসলামের বিধিবিধান এবং দীনী ইলম শেখানোর জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন হযরত মুসআব বিন উমাইর রাযি.-কে। আরও পাঠান অন্ধ ক্বারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-কে। -তারীখে উম্মতে মুসলিমা ১/২০৭

হযরত মুসআব রাযি.-কে ইয়াসরিবে ক্বারী ও মুকরি' নামে ডাকা হতো। তিনি হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ রাযি.-এর গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইয়াসরিববাসীদের কুরআন ও দীন শেখাতেন আবার তাদের নামাযে ইমামতিও করতেন। ইসলামের দাওয়াতেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। তাঁর দাওয়াতেই ইসলাম গ্রহণ করেন আউস গোত্রের দুই সর্দার সা'দ বিন মু'আয এবং উসাইদ ইবনে হুজাইর রাযি.। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর দাওয়াতে পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। হযরত মুসআব রাযি. আসআদ ইবনে যুরারাহ রাযি.-এর ঘরে থেকে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যান। এমনকি আনসারদের প্রায় সকল ঘরে উল্লেখযোগ্য নারী-পুরুষ মুসলমান হয়ে যান। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৪-৪৩৭

দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা এবং মদীনায ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি নির্ধারণী সভা

এর পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক বাইআতে আকাবায় সানিয়াহ বা দ্বিতীয় আকাবাহ চুক্তি। এ বছর হজ্জের মওসুমে ইয়াসরিববাসীগণ

পুনরায় উপস্থিত হলেন। সেই ঘটনা শুনুন সেখানে উপস্থিতদের একজন হযরত জাবের রাযি.-এর যবানীতে। তিনি বলেন, অতঃপর আমাদের আল্লাহ তাঁ'আলা প্রেরণা দান করলেন। আমরা শলাপরামর্শ করে একত্র হলাম। তখন আমরা আলাপ করলাম যে, কতদিন আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থায় ছেড়ে রাখব যে, তিনি মক্কার পাহাড়গুলোতে ঘুরবেন আর ভীত হবেন! তারপর আমাদের মধ্যে সত্তরজন সফর করলেন, তাঁরা হজ্জের মওসুমে তার নিকট হাজির হলেন। তখন আকাবার উপত্যকায় আমাদের একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সেখানে আমরা একে একে সবাই একত্রিত হলাম। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীসের উপর বাইআত নেব? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তোমরা বাইআত নাও এই কথার উপর যে, তোমরা শুনবে ও আনুগত্য করবে, উদ্যমে ও অবসাদে, দান করবে স্বচ্ছল অবস্থাতেও এবং সঙ্কটে থাকা অবস্থাতেও, সৎকাজে আদেশ করবে আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আল্লাহর কথা বলবে; কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করবে না। আর এই কথার উপর বাইআত নাও যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে যখন আমি তোমাদের নিকট ইয়াসিরবে গমন করব; তোমাদের নিজেদের ও স্ত্রী-সন্তানদের যেভাবে সুরক্ষা দাও আমাকে সেভাবে সুরক্ষা দিবে। (বিনিময়ে) তোমাদের জন্য থাকবে জান্নাত।

আমরা বাইআতের জন্য প্রস্তুত হলাম। তখন আসআদ বিন যুরারাহ তাঁর হাত ধরলেন। আসআদ ছিলেন সত্তরজনের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠ। তার চেয়ে ছোট শুধু আমি ছিলাম। তিনি বললেন, ইয়াসিরবাবসীরা! থামো! আমরা বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি এটা নিশ্চিত জেনে যে, তিনি আল্লাহর রসূল। আজ তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়ার (পরিকল্পনার) মানে হলো, পুরো আরববাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তোমাদের শ্রেষ্ঠদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, আর তরবারীর আঘাতে বিক্ষত হওয়া। হয় তোমরা তরবারীর আঘাত, তোমাদের শ্রেষ্ঠজনদের প্রাণহরণ আর পুরো আরববাসী থেকে বিচ্ছিন্নতাকে সহ্য করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা বাইআত নাও। তোমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট। আর যদি তোমরা প্রাণের ভয় করো, তাহলে বাদ দাও। এটা আল্লাহর নিকট (বাইআত নিয়ে অটল না থাকার চেয়ে) ওযর হিসেবে তুলনামূলক বেশি চলনসই। আমরা বললাম, তুমি হাত সম্প্রসারিত করো হে আসআদ বিন যুরারাহ! আল্লাহর শপথ, এই বাইআত আমরা ছাড়বো না, এর থেকে পিছু হটবো না। তখন আমরা একজন একজন করে বাইআত নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের থেকে তাঁর শর্তের

(প্রতিশ্রুতি) নিচ্ছিলেন, আর বিনিময়ে জান্নাতের (ওয়াদা) দিচ্ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫৩)

ইবনে ইসহাক হযরত কা'ব ইবনে মালেকের সূত্রে বলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৭৩ জন। আইয়ামে তামিমীকের মাঝামাঝি সময়ে হজ্জের শেষে গভীর রাতে তাঁরা একত্রিত হন জামরায়ে আকাবার নিকট উপত্যকায়। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি.সহ উপস্থিত হন। আব্বাস রাযি. তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখন আব্বাস রাযি. সর্বপ্রথম কথা বলেন। তিনি বলেন, হে ইয়াসিরব থেকে আগত লোকেরা! মুহাম্মদ আমাদের লোক, তোমরা তা জানো। আমরা তাকে আমাদের গোত্রের লোকদের থেকে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যারা এখনও আমাদের চিন্তার উপর বিদ্যমান (ঈমান আনেনি)। সে নিজ গোত্রে সম্মানিত, নিজ এলাকায় সংরক্ষিত। তবে সে তোমাদের নিকট তোমাদের সাথে যুক্ত হতে প্রত্যাশী। যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরা যে কথা বলে তাকে নিতে চাচ্ছ সেটা রক্ষা করবে এবং তাকে তার বিরোধীদের থেকে রক্ষা করবে, তাহলে তোমরা এই দায়িত্বসহ তাকে নিতে পার। আর যদি মনে করো যে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তোমরা তাকে সাহায্য না করে ছেড়ে দিবে, তাহলে এখনই তাকে ছেড়ে দাও। কারণ সে এখানে নিজ গোত্রে নিজ এলাকায় সম্মান ও নিরাপত্তায় আছে। কা'ব বিন মালেক বলেন, তখন আমরা বললাম, আপনার কথা শুনেছি। এখন আপনি বলুন হে আল্লাহর রসূল! এবং নিজের জন্য ও আপনার রবের জন্য যা পছন্দ করেন তা আমাদের থেকে গ্রহণ করুন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত গ্রহণ করলেন। তখন হযরত বারা ইবনে মা'রুর রাযি. বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমরা ঘরের ভেতরের মানুষদের যেভাবে রক্ষা করি আপনাকেও সেভাবে রক্ষা করবো। আমরা বাইআত নিলাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা হলাম যোদ্ধা জাতি, বংশপরম্পরায় আমরা তা লাভ করেছি। তখন আবুল হাইসাম মালেক ইবনে তাইয়িহান মাঝখান থেকে বললেন, আমাদের মাঝে এবং অপর লোকদের মাঝে (ইহুদী উদ্দেশ্য) চুক্তি রয়েছে। আমরা সেগুলো বাতিল করব। যদি আমরা সেটা করি, অতঃপর আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন, তখন কি আমাদের ছেড়ে আপনার গোত্রে ফিরে যাবেন? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'আদ দাম আদ দাম, ওয়াল হাদাম আল হাদাম!' (অর্থাৎ আমার দায় তোমাদের দায়, আমার সম্মান তোমাদের সম্মান) আমি তোমাদের তোমরা আমাদের। তোমরা যাদের সাথে লড়বে আমরাও তাদের সাথে লড়ব, তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে আমরাও তাদের সাথে সন্ধি করব। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আ.-এর

তাদের মধ্যে বারো জন নকীব বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করে দেন। যারা নিজ নিজ গোত্রের দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করবেন। নয়জন খায়রাজের আর তিনজন আউসের। তাঁদের মধ্যে আসআদ বিন যুরারাহ, সা'দ বিন উবাদাহ, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা, উবাদাহ বিন সামেত, উসাইদ বিন হুজাইর প্রমুখ ছিলেন। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৪১-৪৪৪

বর্ণিত আছে, নুকাবাদের মধ্যে প্রধান নাকীব বানানো হয়েছিল হযরত আসআদ বিন যুরারাহ রাযি.-কে। -সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৩/২০৪

এভাবেই এই ঐতিহাসিক বাইআতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় মদীনায়ে ইসলামী রাষ্ট্র তৈরির নীতিগত সিদ্ধান্ত। বলা যায়, এটাই ছিলো মদীনা নামক ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা। এই বাইআতের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধানও এক অর্থে নির্ধারিত হয়ে যায়।

নবভূমিতে হিজরত

দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার কিছুদিন পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে কেরাম একে একে হিজরত করতে থাকেন। নবুওয়াতের ১৩তম বছর কুরাইশদের দারুন নাদওয়ায় ষড়যন্ত্র হয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবীজীর হিজরতের নির্দেশনাও এসে যায়। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযি., তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা, পথপ্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিতসহ হিজরত করেন। দিনটি ছিলো ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার। ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনাংলগ্ন কুবা পল্লীতে পৌছেন। সেখানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর চারদিন থেকে ১২ই রবিউল আউয়াল মদীনায়ে রওনা করেন। চারদিক থেকে শ্রোগানে গুঞ্জরিত হয়। আনসারগণ রাস্তায়, গলিসমূহে ও বাড়ির ছাদগুলোতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনের জন্য একত্র হয়েছিলেন। শিশুরা 'তুলাআল বাদরু আলাইনা...' গেয়ে অভ্যর্থনা জানায়। নবীজীকে একের পর এক আনসারগণ নিজের ঘরে আসার অনুরোধ করছিলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন, উটনীকে যেতে দাও, কারণ সে নির্দেশপ্রাপ্ত। সর্বশেষ উটনী গিয়ে হযরত আবু আইউব আনসারী রাযি.-এর বাড়ির সন্নিকটে গিয়ে অবস্থান নেয়। এই জায়গা ছিলো দুই ইয়াতীম বালক সাহল ও সুহাইলের মালিকানাধীন। তাঁরা বিনামূল্যে জমিটি দিতে চাইলেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনিময় দিয়ে জমিটি খরিদ করেন। অতঃপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজে নবীজী নিজে অংশ গ্রহণ করেন। এটাই হলো মসজিদে নববী। এর দেয়ালগুলো কাঁচা ইট, স্তম্ভগুলো খেজুরকাণ্ড আর ছাদ খেজুর গাছের

ডাল দিয়ে নির্মিত ছিলো। লম্বা ১০৫ ফুট, চওড়া ৯০ ফুট ছিলো। -তারীখে উম্মাতে মুসলিমা ১/২২৫

মসজিদে নববীর দক্ষিণ দিকে দারুল আরকাম ও মাদরাসায়ে মুসআব বিন উমাইরের পর ইসলামের প্রথম মাদরাসা সুফফাহর সূত্রপাত হয়। সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণ এখানে থাকতেন আর ইলম চর্চা করতেন। মসজিদে নববী ছিলো ইসলামের প্রধান কেন্দ্র, সেই সাথে এটাই ছিলো রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্র। এখান থেকেই দীনী ও রাষ্ট্রীয় সকল নির্দেশনামা জারী করা হত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে ইয়াসরিব হয়ে যায় মদীনাতে রাসূল। আউস ও খায়রাজ হয়ে যায় আনসার। তাঁদের আনসার নাম আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁদের দেন। -সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৭৭৬

আল্লাহ তা'আলা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দেন। আনসারগণ এই ভ্রাতৃত্বকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, নিজেদের ঘর, বাগান ও সম্পদগুলোও ভাগাভাগি করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাজিরগণ অল্পতে সন্তুষ্ট থেকেছেন। এভাবে সকলে নিজেদের পূর্বপরিচয় পেছনে রেখে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হন। তৈরি হয় এক সুন্দর সুখম সমাজ। প্রতিষ্ঠিত হয় ইনসাফ। সর্বক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা পূর্বের পরিভাষাসমূহের জায়গা দখল করে। মদীনায়ে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধান অবতীর্ণ হয়। যে বিধানগুলো মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যথা আযানের প্রচলন, যোহর, আসর ও ইশা চার রাকাত হয়; ইতোপূর্বে যা দুই রাকাত ছিলো।

নতুন রাষ্ট্রের সমূহ নিরাপত্তাশঙ্কা;

এ বিষয়ে নতুন বিধানের অবতরণ ও নীতিপ্রণয়ন

সদ্য অঙ্কুরোদ্গত এই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা ছিলো। একদিকে ছিলো মদীনার তিন ইহুদী গোত্র; বনু কাইনুকা, বনু নজীর, বনু কুরাইজাহ। অন্য দিকে ছিলো প্রবীণ বয়সের মুনাফিকরা। বাহ্যিকভাবে যারা মুসলমান ভাব দেখাত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছিলো চরম শত্রু। যাদের প্রধান ছিলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল। যাকে ইতিপূর্বের মদীনার প্রধান সর্দার বানানোর পরিকল্পনা হচ্ছিল। এই উভয় দল ছিলো আভ্যন্তরীণ শত্রু। আর বাইরে থেকে ছিলো মক্কার কুরাইশদের থেকে শঙ্কা। তারা আরব ভূমিতে মুহাম্মাদের শত্রু ঘাটি গাড়াতে কখনোই ভালো চোখে দেখত না। সে কারণে তারা আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে চিঠি লিখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য উকিয়ে দেয়। পাশাপাশি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত

বসবাসকারী গোত্রগুলো ছিলো কুরাইশদের মিত্র। তাদেরকে উক্ষিয়ে কুরাইশরা মদীনার দক্ষিণ দিকে আসা-যাওয়ার পথকে বন্ধ করে দেয়। যে কারণে ইয়ামান ও তার আশপাশের ইসলাম গ্রহণকারীদের মদীনায় আনাগোনা একটা সময় পর্যন্ত খুব কঠিন ছিলো। তাছাড়া মদীনার উপর কুরাইশদের আক্রমণের সম্ভাবনা তো ছিলই। এই সকল পরিস্থিতি বিবেচনায় মদীনার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করতে এবং রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থাপনা সুবিন্যস্ত করতে মদীনায় আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলো ও ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সনদ তৈরি করা হয়। যা ঐতিহাসিক ‘মদীনা সনদ’ নামে প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিক মদীনা-সনদ

এই সনদের দফাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই সনদনামা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে লিখিত, যা কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন মুসলমানগণ এবং যারা তাদের অনুগামী হয়ে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং লড়াই করেছে- তাদের জন্য প্রযোজ্য।
২. তারা সকলেই অন্য লোকদের বিপরীতে এক জাতি।
৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ পূর্বের অবস্থায় থাকবে, নিজেদের মাঝে পরস্পর রক্তপণের দায় বহন করবে, নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে, নীতিসম্মতভাবে এবং মুমিনদের মাঝে ইনসাফ রক্ষা করে। (একই কথা বনু আউফ, বনু সাইদাহ, বনু হারিস, বনু জুশাম, বনু নাজ্জার, বনু আমর বিন আউফ, বনু নাবীত, বনু আউস -যেগুলো আনসারদের একেকটি গোত্র-এর ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়)
৪. মুমিনগণ তাদের মাঝে কোনো মুক্তিপণ বা রক্তপণে ঋণগ্রস্থকে নীতিসম্মত অনুদানে বিরত হবে না।
৫. মুমিন অপর মুমিনের মিত্রের সাথে তাকে বাদ দিয়ে চুক্তি করবে না।
৬. মুত্তাকী মুমিনগণ তাদের মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করবে কিংবা জুলুম, অপরাধ, বাড়াবাড়ি কিংবা মুমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার মত অনাচার করবে তার বিরুদ্ধে সকলে একজোট একহস্ত থাকবে। যদিও সে তাদের কারো সন্তানও হয়।
৭. কোনো মুমিন মুমিনকে হত্যা করবে না কোনো কাফেরের জন্য। কোনো মুমিনের বিপরিতে কাফেরকে সাহায্য করবে না।
৮. আল্লাহর প্রদত্ত নিরাপত্তা একক। সকল মুমিনের পক্ষ থেকে নগণ্য একজনের নিরাপত্তা প্রদান প্রযোজ্য হবে।
৯. অন্য সকলের বিপরিতে মুমিনগণ পরস্পর একে অপরের মিত্র। তবে যে সকল ইহুদী আমাদের অনুগত তার জন্য রয়েছে সাহায্য ও সমতা। তাদের

উপর জুলুম করা হবে না এবং জোট বেঁধে তাদের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করা হবে না।

১০. মুমিনদের শান্তিচুক্তি একক। আল্লাহর পথের লড়াইয়ে কোনো মুমিন অন্য মুমিনের প্রতিকূলে নিরাপত্তা চুক্তি করবে না। তবে পরস্পর মিলেমিশে ও ইনসাফ রক্ষা করে করতে পারবে।

১১. প্রত্যেক যোদ্ধাদল যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারা একের পর এক করবে

১২. মুমিনগণ আল্লাহর পথের লড়াইয়ে তাদের কেউ হতাহত হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। নিশ্চয় মুত্তাকী মুমিনগণ শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত।

১৩. কোনো মুশরিক কুরাইশদের সম্পদ বা ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিবে না। কোনো মুমিনের জন্য তার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।

১৪. যে বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে এবং তা প্রমাণিত হবে, তাকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে। তবে নিহতের অভিভাবক কিসাস ক্ষমা করতে রাজি হলে ভিন্ন কথা। সকল মুমিন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ না করা কোনো মুমিনের জন্য হালাল নয়।

১৫. কোনো মুমিন যে এই সনদপত্রকে মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য হালাল নয় যে, কোনো (দীনের বিষয়ে) নব আবিষ্কারকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে। যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে তার উপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহর অভিশাপ এবং ক্রোধ নিপতিত হবে। তার ফরজ নফল কোনো আমল কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মাঝে যে কোনো মতবিরোধ হোক তার সমাধান আল্লাহ তা’আলা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্পণ করতে হবে।

১৭. ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে খরচ করবে যতক্ষণ লড়াইরত থাকে।

১৮. বনু আউফের মিত্র ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একজোট। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। তারা নিজেরা ও তাদের মিত্ররা মুমিনদের সাথে একজোট। তবে যে অন্যায় বা অনাচার করে তার কথা ভিন্ন। সে শুধু নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ধ্বংস করে। (এরপর বনু নাজ্জার, বনু হারেস, বনু সাইদাহ, বনু জুশাম, বনু আউস এবং বনু সা’লাবার মিত্র ইহুদীদের জন্য একই কথা উল্লেখ করা হয়। তবে যে অন্যায় বা অনাচার করে তার কথা ভিন্ন, সে তো কেবল নিজেকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস করে। সা’লাবার শাখা তাদের অন্তর্ভুক্ত। বনু শাতিবায়ার জন্যও একই কথা যা বনু আউফের মিত্র ইহুদীদের ক্ষেত্রে বলা হলো। এই বিধান কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অনাচারের

ক্ষেত্রে নয়। সাঁলাবার মিত্রদেরও একই বিধান। ইহুদীদের শাখার বিধান তাদের মতই।)

১৯. উপরের ধারায় উল্লিখিতরা কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধে) বের হবে না। তাদের কেউ কোনো আঘাতের প্রতিশোধে বাঁধা হবে না। যে ধ্বংস করবে সে নিজেকে আর নিজ পরিবারকেই করবে। যে অন্যায় করবে সে (সর্বদাই) আলাদা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এসব ক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষে।

২০. ইহুদী খরচ তাদের যিম্মায়, মুসলমানদের খরচ মুসলমানদের যিম্মায়। তবে যে এই সনদে অন্তর্ভুক্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাদের বিরুদ্ধে তারা পরস্পর সহযোগী হবে। তাদের মাঝে থাকবে কল্যাণোপদেশ ও কল্যাণকামিতা। থাকবে সদাচার, অনাচার নয়।

২১. কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের অপরাধে অপরাধী হবে না। সাহায্য মজলুমই পাবে।

২২. ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে খরচ করবে লড়াই কালে।

২৩. ইয়াসরিবের অভ্যন্তর এই সনদে অন্তর্ভুক্তদের জন্য হারাম/পবিত্র ভূমি। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনার মত। তবে ক্ষতি ও অপরাধ করলে তার ব্যাপার ভিন্ন। কোনো নিরাপত্তাবেষ্টিত স্থানে কাউকে সেখানকার লোকদের অনুমিত ছাড়া নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না।

২৪. এই সনদে অন্তর্ভুক্তদের মাঝে যদি কোনো দুর্ঘটনা বা বিরোধ হয় যার কারণে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা তৈরি হয় তবে সেটার মীমাংসা অর্পিত হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই সনদের সর্বাধিক কল্যাণজনক ও যথার্থ পন্থার পক্ষপাতী।

২৫. কুরাইশ এবং তাদের সহায়তাকারীদের নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। মদীনায় যারা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে সকলে সহযোগী হবে। তারা যদি সন্ধির দিকে আহ্বান করে তবে তাদের সাথে সন্ধি করা হবে। মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য তা রক্ষা করা হবে। তবে দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তার কথা ভিন্ন। প্রত্যেকের দায়িত্বে ঐটুকু অংশ সংরক্ষিত থাকবে যেটুকু তারা দায় গ্রহণ করেছে। (আউসের মিত্র ইহুদীদের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয় যে, তাদের জন্য এই সনদের বিষয়গুলো প্রদত্ত হবে কল্যাণজনক ক্ষেত্রে।) কল্যাণের ক্ষেত্রে এই সনদ প্রযোজ্য অন্যায়ের ক্ষেত্রে নয়। যে যেই কর্ম করবে তার দায় তার উপরই। আল্লাহ এই সনদের সর্বাধিক কল্যাণজনক ও সত্যতাপূর্ণ বিষয়ের পক্ষে। এই সনদ কোনো অন্যায়কারী বা অনাচারীর পক্ষে কাজ করবে না। মদীনায় যে বের হবে সে নিরাপদ। যে অবস্থান করবে সে নিরাপদ। আল্লাহ সদাচারী ও মুত্তাকীর

সহায়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই। -সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৫০২-৫০৪

সনদের ধারাগুলো থেকেই স্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও বহির্নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার মূলনীতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

জিহাদের বিধান

ইসলামী রাষ্ট্রের হিফাযত এবং ইসলামকে সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিধানটি এই পর্যায়ে অবতীর্ণ হয় তা হলো, জিহাদের বিধান। আলোচনার শুরু দিকে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মক্কা এবং মদীনার শুরুর দিকে মুসলমানদের শক্তি সংরক্ষণ এবং টিকে থাকার খাতিরে লড়াইয়ের অনুমতি ছিলো না। কিন্তু মদীনায় মোটামুটি স্থিত হওয়ার পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। নিজেদের টিকিয়ে রেখে ইসলামের ভূমি হিফাযত এবং কুফরের দর্প চূর্ণ করার জন্য জিহাদের বিধান এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছিলো। সর্বপ্রথম সূরা হজ্বের ৩৯ নম্বর আয়াতে কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়। এই আয়াতে বলা হয়,

যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের অনুমতি দেওয়া হলো (তারা নিজেদের আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করতে পারবে), যেহেতু তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

এটা ছিলো আক্রান্ত হলে যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত। এখানে যুদ্ধকে ফরজ করা হয়নি। এরপর সূরা বাকারার ১৯০ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে যারা আক্রমণ করে তাদের সাথে লড়াইকে ফরয করা হয়। এই আয়াতে বলা হয়,

তোমরা লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাদের সাথে।

এরপরের স্তরে সকল মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। -যাদুল মা'আদ ৩/৬২

জিহাদের অভিযানসমূহ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর হযরত সা'দ বিন মু'আয রাযি. উমরা করার জন্য মক্কা যান। তখন তার পুরনো বন্ধু উমাইয়া বিন খালাফের নিকট অবস্থান করেন। একদিন উমাইয়াকে সাথে নিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে যান। তখন আবু জাহল তাকে ধমক দিয়ে বলে, তোমাকে নিরাপদে কা'বা তাওয়াফ করতে দেখছি! অথচ তোমরা ধর্মত্যাগী বদদীনদের আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদের সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা করেছ। যদি তোমার সাথে আবু সাফওয়ান উমাইয়া না থাকত তাহলে তুমি নিরাপদে এখান

থেকে পরিবারের নিকট ফিরতে পারতে না।’ এর জবাবে হযরত সা’দ বিন মু’আয রাযি. উচ্চস্বরে বলেন,

তোমরা যদি আমাদের কাবা যিয়ারত থেকে বাঁধা দাও তাহলে আমরা এরচে গুরুতর ক্ষেত্রে তোমাদের বাঁধা দিব। মদীনার নিকট দিয়ে তোমাদের সিরিয়ার ব্যবসায়িক পথ অবরুদ্ধ করে দিব।

—সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৯৫০

এই দ্বিপাক্ষিক হুমকি উভয় দিক থেকে বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রথম দিকে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। হিজরতে সাত মাস পর রমজান মাসে সর্বপ্রথম অভিযান হযরত হামযা রাযি.-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ত্রিশজন মুহাজির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা আবু জাহলের নেতৃত্বে অতিক্রমকারী একটি ব্যবসায়িক কাফেলাকে সতর্কবাণী দিয়ে আসেন। শাওয়াল মাসে হযরত উবাইদা বিন হারিস রাযি.-এর নেতৃত্বে বাতনে রাবেগে একটি বাহিনী পাঠানো হয়। সেখানে আবু সুফিয়ানের একটি কাফেলাকে ভয় দেখানো হয়। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানে কুরাইশের এক বড় সর্দার আমর বিন হাজরামী নিহত হয়। এরপর দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে কুরাইশদের এক বৃহৎ কাফেলা যা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে ফিরছিল সেটাকে বাঁধা দিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বের হয়ে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের প্রভাব ও শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। বদরের পর ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা’-কে অবরোধ করে মদীনা থেকে উৎখাত করা হয়। কারণ তারা চুক্তির বিপরীতে কুরাইশদের সাথে মিত্রতার প্রচেষ্টায় কোনো কমতি রাখেনি। সে সাথে তাদের আরও কিছু বাড়াবাড়িও ঘটেছিল। তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হন। মুমিনদের বিপদে ভেঙ্গে না পড়ার শিক্ষাপ্রদান করা হয়, ভবিষ্যতের জন্য তাদের দৃঢ়পদ থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে মুমিনদের জন্য বহুরকম শিক্ষা ছিলো। এরপর বনু নজীরকে উৎখাত করে দেশান্তর করা হয়। ইহুদীদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও তাতে তারা অংশ নেয়নি। সেই সাথে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পঞ্চম হিজরীতে পূর্বে মদীনা থেকে উৎখাতকৃত ইহুদীগোত্র বনু নজীর কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সাথে যোগসাজশ করে একটি একাজোট গঠন করে। সবগুলো গোত্র মিলে প্রায় দশ হাজার যোদ্ধার দল মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু তিন সপ্তাহের অবরোধেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে খননকৃত পরীখা অতিক্রম করতে পারেনি। এসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাথর ভাঙতে গিয়ে তিনবারের আঘাতে তিনটি আলোর বলক দেখতে পান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অবগত করেন যে, প্রথম বলকে ইয়ামান, দ্বিতীয় বলকে সিরিয়া ও পশ্চিম, তৃতীয় বলকে পূর্বদিক বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। পরিশেষে খোদায়ী নুসরতে ঝড়ো বাতাসের কারণে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

এখন থেকে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে অভিযান চালাব, তারা আর চালাতে পারবে না। আমরা অগ্রসর হবো তাদের দিকে। —সহীহ বুখারী; হাদীস ৪১১০

এই যুদ্ধের ব্যর্থতা ভবিষ্যতে তাদের যুদ্ধাভিযানের সামর্থ্য শেষ করে দিয়েছিল। এরপরই খন্দক যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বনু কুরাইযাকে অবরোধ করে তাদের হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহকারীদের প্রয়োজনে হত্যার নমুনা স্থাপিত হয়। সে সাথে বনু কুরাইজার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হয়; কারণ তারা যুদ্ধ চলাকালে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ষষ্ঠ হিজরী যু-কা’দা মাসে নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা করতে যান। কুরাইশরা তাদের হুমকি অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁধা দেয়। এক পর্যায়ে নবীজীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত হযরত উসমান রাযি.-কে হত্যার গুজব ছড়িয়ে গেলে সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতিশোধের জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। যাকে বাইআতে রিয়ওয়ান বলা হয়। তখন কুরাইশরা অবস্থা বেগতিক দেখে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তির কিছু শর্ত বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল ছিলো না। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দূরদর্শীতায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে আসবে। চুক্তির একটি শর্ত ছিলো যে কেউ মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় আসলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সে হিসেবে হযরত আবু জান্দাল রাযি. কে ওখান থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আর হযরত আবু বাসীর রাযি. মদীনায় আসার পর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন আবু বাসীর রাযি. সমুদ্রপাড়ে চলে যান। তার সাথে যুক্ত হন আবু জান্দাল রাযি. এবং মক্কার জুলুম থেকে মুক্তিকামী অন্যান্য মুসলমানগণ। যাদের আক্রমণের কারণে কুরাইশদের ব্যবসায়িক সকল কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন কুরাইশরা নিজেরাই চুক্তির এই ধারাটি বাতিল করতে বলে। মূলত হুদাইবিয়ায় কুরাইশদের চুক্তিতে রাজি হওয়াই ছিলো মদীনার স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানের নামান্তর। সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উত্তরে ১৪৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত খাইবার অভিযান করেন। যেখানে মদীনা থেকে নির্বাসিত ইহুদীদের আবাস ছিলো।

ঐতিহাসিক ইসমাইল রাইহানের মতে খাইবার ছিলো প্রথমবারের মত উল্লেখযোগ্য ইকদামী জিহাদ (নিরেট আত্মরক্ষা নয়; বরং ইসলামের মর্যাদা বুলন্দ করতে এবং শত্রুদের দর্প চূর্ণ করতে নিজ এলাকার বাইরে অভিযান)। ইসমাইল রাইহান বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবারের অভিযানের পর আরবদের শত শত বছরের সুপ্রিম পাওয়ারের সমাপ্তি ঘটে। এখন আরবের একক বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানরা। কুরাইশদের মুসলমানদের পরাভূত করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। মদীনা এখন আঞ্চলিক শক্তি থেকে উত্তোরণ করে আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিগণিত হতে শুরু করেছে। ফলে এই পর্যায়ে এসে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন বাদশাহদের দাওয়াত দিয়ে এবং আনুগত্যের আহ্বান করে চিঠি পাঠানো শুরু হয়।

এই ধারাবাহিকতায় সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল বসরার শাসক শুরাহবিল বিন আমর গাসসানীর নিকট চিঠি পাঠানো হয়। তখন সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হযরত হারেস বিন উমাইর রাযি. কে শহীদ করে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে বাইজেন্টাইন রোমকদের প্রতি অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে রোমকরা পূর্ণ পরাজিত না হলেও শক্ত ধাক্কা খায়। এদিক হুদাইবিয়ার সন্ধি কুরাইশদের দিক থেকেই ভঙ্গ হয়ে যায়। তারা সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করে নিজেদের মিত্র বনু বকরকে মদীনা রাষ্ট্রের মিত্র বনু খুযাআর বিরুদ্ধে আক্রমণে সহায়তা করে। এর ফলে অষ্টম হিজরীর রমায়ান মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযান পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ফাতহে মক্কা বা মক্কা বিজয় সংগঠিত হয়। যার পর লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। এর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রান্ত মক্কার আশপাশের এলাকাগুলো অধিকার করে নেন এবং কুফর শিরকের পুরনো কেন্দ্রগুলো ধ্বংসের দিকে মনোনিবেশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হুনাইন, তায়েফ ইত্যাদি অভিযান পরিচালিত হয়। এভাবে পুরো আরব ইসলামের অধীনে চলে আসে। পারস্য তখন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় মারাত্মক অস্থিরতার শিকার। নবম হিজরীতে রোমকদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ আসে। তখন তাদের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই অভিযানে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে পুনরায় ফিরে আসা হয়। (যুদ্ধের এই বিবরণ বিশেষত তারীখে উম্মতে মুসলিমার আলোকে লেখা হয়েছে)

এ বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ ইবনু কায়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় আগমনের পর মোট সাতাশটি অভিযান নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশ নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। কারো কারো মতে এমন লড়াইয়ের সংখ্যা পঁচিশটি, কেউবা বলেন উনত্রিশটি। এর মধ্যে লড়াই

হয়েছে মোট নয়টিতে; বদর, উহুদ, খন্দক, কুরাইজা, মুস্তালিক, খাইবার, ফাতহে মক্কা, হুনাইন এবং তায়েফ। কেউ কেউ বলেছেন, বনু নযীর, গাবাহ এবং খাইবারের অধীন ওয়াদিয়ে কুরার মধ্যেও লড়াই হয়েছে। আর নিজে অংশগ্রহণ না করে প্রেরিত ছোট ছোট অভিযানগুলো ষাটটির কাছাকাছি।

বৃহৎ এবং প্রধান যুদ্ধ সাতটি; বদর, উহুদ, খন্দক, খাইবার, ফাতহে মক্কা, হুনাইন ও তাবুক। এই যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আনফাল বদরের ব্যাপারে, সূরা আলে ইমরানের ১২১ নম্বর আয়াত থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত উহুদ সম্পর্কে, খন্দক কুরাইজা এবং খাইবার সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুর আয়াতগুলো, সূরা হাশর বনু নজীর সম্পর্কে, হুদাইবিয়া এবং খাইবারের ঘটনা সম্পর্কে সূরা ফাতহ নাযিল হয়েছে। সেই সাথে এর মধ্যে ফাতহে মক্কার ইঙ্গিত আছে, আর ফাতহে মক্কার ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ আছে সূরা নাসরে।

এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়েছিলেন শুধু উহুদ যুদ্ধে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফেরেশতাগণ লড়াই করেছেন বদর এবং হুনাইনে। আর খন্দকে ফেরেশতারা অবতরণ করেছেন এবং মুশরিকদের প্রকম্পিত করে পরাস্ত করেছেন। এই যুদ্ধে মুশরিকদের চেহায়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তারা পালিয়ে যায়। (রীতিমত লড়াই করে) বিজয় হয় দুটি যুদ্ধে; বদর এবং হুনাইন। মিনজানিক দ্বারা যুদ্ধ হয় একটিতে; তায়েফ। পরিখা দ্বারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেন একটিতে, সেটা হলো আহযাবের (খন্দক) যুদ্ধ। পরিখার পরামর্শ দিয়েছিলেন হযরত সালমান ফারসী রাযি.। -যাদুল মা'আদ ১/১২৫

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের আদর্শ

যুদ্ধে অসমর্থ ছোটদের নিতেন না। মা-বাবার অনুমতি ছাড়া জিহাদের অনুমতি দিতেন না। যখন কোনো দিকে অভিযানের ইচ্ছা করতেন তখন ইঙ্গিতবহু শব্দে বলতেন যেন শত্রু বিভ্রান্ত হয়। যুদ্ধের আগে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। বিস্তারিত, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৯/১০৬।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোনো বড় বা ছোট বাহিনীর আমীর/সেনাপতি বানাতেন তখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে তাকওয়ার উপদেশ দিতেন এবং বাহিনীতে থাকা অন্য মুসলমানদের সাথে কল্যাণকর আচরণের নির্দেশনা দিতেন। অতঃপর বলতেন, তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই করবে। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে তাদের সাথে লড়াই করবে। লড়াই করবে কিন্তু গনীমতের সম্পদে খেয়ানত করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মৃতদেহ বিকৃত করবে না। কোনো শিশুকে হত্যা

করবে না। যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তিনটি বিষয়ের কোনো একটির দিকে আস্থান করবে। যদি কোন একটি তারা মেনে নেয় তাহলে তোমরা গ্রহণ করে নিবে। এবং তাদের সাথে লড়াই থেকে বিরত থাকবে। তাদের ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা কবুল করে তাহলে লড়াই থেকে বিরত থাকবে। (ইসলাম গ্রহণের পর) তাদেরকে তাদের এলাকা থেকে মুহাজিরদের এলাকায় (দারুল মুহাজিরীন-তৎকালে মদীনা) হিজরতের দাওয়াত দিবে। এবং তাদের জানাবে যে, যদি তারা হিজরত করে তাহলে তাদের জন্য ঐ সকল সুবিধা প্রযোজ্য হবে যেগুলো মুহাজিরদের জন্য প্রযোজ্য। এবং তাদের উপর ঐ সব দায় বর্তাবে যা মুহাজিরদের উপর বর্তায়। যদি তারা দার/এলাকা পরিবর্তন করতে না চায় তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা বেদুইন মুসলমানদের মত। ঈমানদারদের উপর আল্লাহর যে সকল বিধান রয়েছে তাদের উপর তা থাকবোতবে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং ফাই (যুদ্ধাভিযানে লড়াই ছাড়াই পরাজয় স্বীকারকারী শত্রু থেকে প্রাপ্ত সম্পদ)-এর মধ্যে তাদের অধিকার নেই যতক্ষণ না তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। (যাই হোক) যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের থেকে জিয়য়া দাবী করো। যদি তারা রাজী হয়, তাহলে তা গ্রহণ করে লড়াই থেকে বিরত থাক। যদি তারা সেটাতেও রাজি না হয় তাহলে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে লড়াই শুরু করো। ... -সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৭৩১

অপর বর্ণনায় এক যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নারীকে নিহত অবস্থায় দেখলেন। তখন নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

-সহীহ বুখারী; হাদীস ৩০১৫

আরেক বর্ণনায় আছে, তোমরা অশীতিপর বৃদ্ধকে হত্যা করো না। -সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২৬১৪

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যুদ্ধে নারীদের নিয়ে যেতেন? তিনি উত্তরে বলেন যে, হ্যাঁ, নিয়ে যেতেন। তবে তারা আহতদের চিকিৎসার কাজ করতেন। আর গনীমত থেকে তাদের অনির্ধারিতভাবে কিছু দিয়ে দেওয়া হত। নিয়মতান্ত্রিক অংশ সাব্যস্ত করা হত না। -সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮১২

যুদ্ধে বন্দীদের কারও উপর অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিতেন, কাউকে হত্যা করতেন, কাউকে মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দিতেন আর কাউকে বন্দীবিনিময় করে ছেড়ে দিতেন। ইসলাম গ্রহণ না করলে কোনো কোনো বন্দীকে দাস বানাতেন। বন্দীদের এক পরিবারের সদস্যদেরকে আলাদা করতেন না। একসাথে রাখতেন। -যাদুল মা'আদ ৩/৯৯

শত্রু গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে অবস্থানভেদে সিদ্ধান্ত নিতেন। অপর দিকে আবু লুবাবা এবং হাতেব রাযি.-কে হত্যা করেননি; বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন। -যাদুল মা'আদ ৩/১০৪, ১২১

চুক্তি ও সন্ধির নীতিমালা

চুক্তি ও সন্ধির নীতিমালায় মূল কথা ছিলো, মুমিনগণের নগণ্য থেকে নগণ্য সদস্যের প্রদত্ত নিরাপত্তা কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না। সকল মুমিন এক্ষেত্রে একক ও অবিভাজ্য। যে চুক্তি ভঙ্গ করবে, কিয়ামতের দিন সে পশ্চাদ্দেশে এই গাদ্দারির পতাকা বহন করবে। যদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চুক্তি সমাপ্ত করতে চায় তবে সেটা উভয়পক্ষের সমতার সাথে জানিয়ে দিতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তির ক্ষেত্রে এই কঠোর নিয়ম অনুসরণ করেছেন। বদর যুদ্ধে লোক স্বল্পতার মুহূর্তেও দুই সাহাবী যখন মুশরিকদের কথা দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের সাথে অংশ নিবে না, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে নিষেধ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রসিদ্ধ চুক্তির মধ্যে ইহুদীদের তিনটি গোত্রের সাথে চুক্তি অন্যতম। যাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে উল্লিখিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের কেউ যদি চুক্তি ভঙ্গ করে আর অন্যরা তাকে সমর্থন করে তবে এটা সকলের চুক্তিভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। এটাই প্রয়োগ হয়েছে ইহুদীদের তিন গোত্রের সাথে। এমনিভাবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে সেটাও চুক্তিভঙ্গ। যেমন হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করা প্রসঙ্গে কুরাইশদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অনুরূপভাবে শত্রুদের দূতকে হত্যা করা হবে না। মুসাইলামা কাযযাবের দুই দূতকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, যদি দূতদের হত্যা করা না হত, তাহলে তোমাদের দুজনকে আমি হত্যা করতাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম আরেকটি সন্ধি ছিলো খাইবারবাসীর সঙ্গে। অর্ধেক শস্যের বিনিময়ে তাদের সাথে সন্ধি হয়। তখনও জিয়য়ার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। জিয়য়ার বিধান অষ্টম হিজরিতে সূরা বারআহর মাধ্যমে নাযিল হয়। তখন তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে চুক্তির মাধ্যমে জিয়য়া গ্রহণ করেছেন। অগ্নিপূজক, আহলে কিতাব, নাসারাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তাবুক থেকে ফেরার সময় উকাইদারের সাথে জিয়য়া চুক্তি হয়। হযরত মু'আয রাযি. কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় জিয়য়া গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। হাজার অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের থেকে জিয়য়া নেওয়া হয়। আর মূর্তিপূজকরা তখন প্রায় সব মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদের থেকে নেওয়া হয়নি। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে আরব নয় এমন মুশরিকদের থেকে জিয়য়া নেওয়া যাবে। বিস্তারিত, যাদুল মা'আদ ৩/১১২।

গোয়েন্দা ও সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা

বহু ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যেতেন। তবে তাঁর পক্ষ থেকে গোয়েন্দাও নিয়োজিত থাকত। যাদের মাধ্যমে তিনি সংবাদ গ্রহণ করতেন। সহীহ বুখারীর ৪১১৩ নম্বর বর্ণনায় আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরাইযার সংবাদ সংগ্রহে হযরত যুবাইর রাযি.-কে পাঠিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমের ১৯০১ নম্বর বর্ণনায় আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের আগে বাসবাস/বাসীস রাযি.-কে গোয়েন্দা হিসেবে আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা পর্যবেক্ষণে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া উহুদ যুদ্ধের পর হযরত আলী রাযি.-কে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে কিনা তা পর্যবেক্ষণে পাঠিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন যে, যদি তারা ঘোড়ার উপর আরোহী থাকে তাহলে তারা ফিরে আসবে, আর উটের উপর থাকলে ফিরে আসবে না। -তারীখে উম্মতে মুসলিমা ১/২৭০

খাইবারে হুয়াই বিন আখতাবের চাচা যখন স্বর্ণ ও অলঙ্কারের থলের তথ্য গোপন করেছে তখন যুবাইর রাযি.-কে দায়িত্ব দেন। তখন তিনি তাকে শাস্তি দিয়ে তার থেকে তথ্য উদ্ধার করেন। -যাদুল মা'আদ ৩/১২৯

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

মুনাফিকদের বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিলো। যদিও বিশেষ হিকমতে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। পঞ্চম হিজরীতে বনু মুত্তালিকের যুদ্ধে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের একটি মন্তব্য (মদীনায় ফিরে আমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবানেরা নিঃসমর্যাদার লোকদের অর্থাৎ মুসলমানদের মদীনা থেকে বের করে দিবে) এর প্রেক্ষিতে হযরত উমর রাযি. তাকে হত্যার অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিয়ে বলেন, লোকেরা যেন এমন কথা বলাবলি না করে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করে। -সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৫১৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৮৪

ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা এজন্য করতেন যেন মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতায় পৌঁছে, (দুর্বল ঈমান) মুআল্লাফাতে কলুবের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয় এবং অন্যরা যেন ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়।' তবে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হত না, এমন নয়। একবার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের মসজিদে নববী থেকে মেরে টেনে হেঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়। -সীরাতে ইবনু হিশাম ১/৫২৪

এমনিভাবে গণ্যওয়ায়ে তাবুক থেকে ফেরার পর তাদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে নির্মিত মসজিদে জিরারকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। -তারীখে উম্মতে মুসলিমা ১/৩৬৪

মদীনার বিচার ব্যবস্থা

এক্ষেত্রে উপরে মদীনার সনদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যা কিছু নিয়েই মতবিরোধ হবে তার মীমাংসা নিয়ে আসতে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। কুরআনে কারীমে সূরায় নিসার ৬৫ নম্বর আয়াতে আছে, আপনার রবের শপথ তারা তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজেদের ঝগড়া-বিবাদে আপনাকে বিচারক মানে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে কোনরূপ কুষ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়। মদীনায় অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় সকল বিচারাচার বিষয়ে ধারাবাহিত বিধান অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে প্রধান শাস্তিগুলো যেগুলোকে হুদুদ বলা হয় তথা ব্যাভিচার, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা তোহমত, মদ্যপান ও কিসাসের বিধান দেওয়া হয়। সেই সাথে বেচাকেনা, বিবাহ-তালাক, ভূমি-আইনসহ যাবতীয় বিষয়ের বিধান দেওয়া হয়। যার বিস্তারিত আলোচনা ইলমুল ফিকহে রয়েছে। এই ছোট্ট নিবন্ধে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে আনা সম্ভব নয়। বিস্তারিত দেখুন, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৯/১৬৫, যাদুল মা'আদ ৫/৫।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুলিশপ্রধান ও জন্মাদগণ

যারা তাঁর নির্দেশে অপরাধীর গর্দান উড়িয়ে দিতেন

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিকদাদ বিন আমর, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, আসেম বিন সাবেত বিন আকলাহ, জহহাক বিন সুফয়ান কিলাবী, হযরত কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদাহ আল আনসারী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুলিশ প্রধানের ভূমিকায় ছিলেন। -যাদুল মা'আদ ১/১২৩

মদীনার বিচারকগণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছিলেন প্রধান বিচারক। তবে কয়েকজন সাহাবী ছিলেন বিচারকগণ সম্পন্ন। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নবীজীর নির্দেশে বিচারাচার করতেন। যেমন, হযরত উমর রাযি., আলী রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., উবাই ইবনে কা'ব রাযি., যাবেদ বিন সাবেত রাযি., আবু মূসা আশআরী রাযি.। এছাড়া বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত উকবা বিন আমের রাযি., মা'কিল বিন ইয়াসার, মু'আয বিন জাবাল, উমারাহ বিন হাযম, হুয়াইফা রাযি.-এর নাম। তবে তাঁরা কেউ স্থায়ী কাজী ছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে তাঁরা বিচার করতেন। -সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩২৫

মদীনার মুফতীগণ

হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ফতোয়ার কাজ করতেন। আরও ছিলেন মুআয বিন জাবাল রাযি., আব্দুর রহমান বিন আউফ, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবেত, আম্মার বিন ইয়াসির, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, আবুদদারদা, আবু মুসা আশআরী রাযি.। -সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩২৮

প্রতিনিধি ও গভর্নরগণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নবম হিজরীতে হজ্জের আমীর বানান। তারপর হযরত আলী রাযি.-কে পত্রপাঠের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। হযরত আলী রাযি. খুমুস বন্টন করার জন্য ইয়ামানে পাঠান। কিসরার মৃত্যুর পর বাযান বিন সাসানকে ইয়ামানের গভর্নর বানান। বাযানের মৃত্যুর পর শাহর বিন বাযানকে সানআ ও অধীভুক্ত এলাকাগুলো আমীর নিযুক্ত করা হয়। শাহর নিহত হওয়ার পর খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল আসকে সনআর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুহাজির বিন আবি উমাইয়াকে কিনদাহ এবং সাদাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারীকে হাজারামওতের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। আবু মুসা আশআরীকে যাবীদ, আদান, যামা', সাহিলের গভর্নর বানান। মুআয বিন জাবাল রাযি.-কে জুনদের গভর্নর বানান। আবু সুফিয়ান বিন হরবকে নাজরানের, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে তাইমার, আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার, আমর ইবনুল আসকে ওমানের গভর্নর বানান। সফরে গেলে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-কে।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩৩৮-৩৪০

এছাড়া বেশ কয়েকজন সাহাবাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমি, খনি ও কূপ বরাদ্দ দিয়েছিলেন। -সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৯/৩৫

বিভিন্ন বাদশাহদের কাছে চিঠি

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিভিন্ন বাদশাহদের কাছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ও অনুগত্যের দাওয়াতসহ চিঠি পাঠান। এটা ছিলো মদীনার রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বলিষ্ঠ অবস্থানের বহির্প্রকাশ। কমপক্ষে ৪৫ জন প্রতিনিধিকে তিনি বিভিন্ন শাসকদের কাছে পাঠান। দিহয়াহ কালবী, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ রাযি. তাঁদের অন্যতম। বাদশাহদের মধ্যে নাজাশী, কিসরা, কায়সারসহ তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাদশাহগণ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্য স্বীকার করে, আর কেউ বিপরীতটি করে।

প্রত্যেকের সাথে উপযুক্ত আচরণ করা হয়। বিস্তারিত, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩৪৭-৩৭৪।

নবীজীর লেখকগণ

কমপক্ষে ৪৪ জন লেখক ছিলেন। যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, চার খলীফা, তলহা বিন উবাইদুল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবু সুফিয়ান বিন হারব, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস, খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ, উবাই বিন কা'ব রাযি. প্রমুখ। বিস্তারিত, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩৭৫-৩৯৪।

সদকা এবং যাকাত ও অর্থ ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো যাকাত, উশুর, গনীমত, ফাই, জিয়য়া, শ্বেচ্ছা অনুদান ও চাঁদা এবং নফল সাদাকা। যাকাত সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রবৃদ্ধিযোগ্য সম্পদে আবশ্যিক করা হয়েছে। যথা স্বর্ণ-রৌপ্য/নগদ অর্থ, গবাদি পশু, ব্যবসার সম্পদ ও ফসল। যেগুলো আটটি খাতে বণ্টিত হবে। যা সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। গনীমত ও ফাইয়ের ব্যাখ্যা উপরে গিয়েছে। গনীমতের একপঞ্চমাংশ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার, অন্যান্য ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির ও প্রয়োজনগ্রন্থদের জন্য বরাদ্দ ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তাঁর অংশ ও পরিবারে অংশ মানসুখ হয়ে গেছে। গনীমতের বাকি অংশ প্রথমত যাদের অংশ নির্ধারিত নেই তাদের দিতেন। অতঃপর যাদের অংশ নির্ধারিত আছে তাদের ভাগ করে দিতেন যার যার অংশ অনুপাতে; অশ্বারোহীর জন্য দুই অংশ আর পদাতিকের জন্য এক অংশ। খারাজ ও জিয়য়া যেগুলো অমুসলিমদের থেকে কর হিসেবে নেওয়া হয়, সেগুলো ফাই। ফাই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়। জিয়য়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরেও করা হয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা উত্তোলন করতেন। যেমন তাবুক যুদ্ধের আগে সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা করে চাঁদা দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর রাযি. ঘরের সবকিছু দান করেছিলেন। বিস্তারিত, সদকা, যাকাত ও অর্থ ব্যবস্থা: যাদুল মা'আদ ২/৫, জিয়য়া ও যিম্মাচুক্তি: ঐ ৩/১৩৭, আত্মীয় তথা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের অংশ: ঐ ৩/৯৪, খাবারের খুমুস বের করা হবে না: ঐ ৩/৯৫, যুদ্ধ ছাড়া ফাই ব্যবহারের বিধান: ঐ ৩/৯৬, আরও দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়া শামী ৪/১৩৭, যুদ্ধের খরচে চাঁদা উত্তোলন: তারীখে উম্মাতে মুসলিমা ১/৩৬০।

প্রতিনিধি দলের আগমন

বিদায় হজ্জের পূর্বে তাবুক যুদ্ধের পর ইসলামের বিজয় যখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মদীনা রাষ্ট্র যখন সর্ব স্বীকৃত তখন দলে দলে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। যারা নিজেরাও ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্য স্বীকার করতেন

অতঃপর নিজ গোত্রে গিয়েও দাওয়াতের কাজ করতেন। এর মধ্যে তায়েফ থেকে, বনু তামীম থেকে, বনু আসাদ, বনু ফাযারাহ, বনু মুররাহ থেকে, ইয়ামান, ওমান, বাহরাইন থেকে প্রতিনিধিরা এসে ইসলাম কবুল করেন। আদী ইবনে হাতিম, ওয়ায়েল ইবনে হুজর, জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ, তামীম দারী তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। -সুবুলুল হুদা ৬/২৫৪, তারীখে উম্মতে মুসলিমা ১/৩৬৭

শেষ কথা

আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন,

তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। তিনিই তো নিজ রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য। তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। -সূরা আস সফ; আয়াত ৮, ৯

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. লিখেন,

দলীল-প্রমাণের ময়দানে তো ইসলাম সর্বদা বিজয়ীই আছে এবং থাকবেও। আর বাহ্যিক শক্তিতে মুসলিমদের বিজয়ী থাকার বিষয়টা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত। সে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তারপরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সকলের উপর বিজয়ী ছিলো। অতঃপর তাদের দ্বারা সেসব শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিজয়ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ যামানায় আবার ইসলাম ও মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে। -তাফসীরে তাউযীহুল কুরআন

আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করার এই প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা উল্লেখ করে বিদায় হজ্বের পর আয়াত অবতীর্ণ করেন,

আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা ওদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দীনরূপে পছন্দ করলাম। -সূরা মায়িদা; আয়াত ৩

আল্লামা শাকীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, এই আয়াতখানি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগ আর হেদায়েতের

প্রতিটি অধ্যায় সংক্রান্ত মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন এমনভাবে বর্ণিত হয়েছিল এবং শাখা-প্রশাখার বিবরণও এত তফসীল ও ব্যাপকতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান বিবেচনার যোগ্যই থাকেনি; যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবিয়তের ফলে এমন আজিমুশশান জামাআত তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যাদেরকে কুরআনী শিক্ষার জীবন্ত নমুনা বলা যেতে পারত; যখন মক্কা-বিজয় হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করছিলেন; যখন অত্যন্ত ঘৃণিত খাদ্য ও মৃত জন্তু ভক্ষণকারী জাতি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করছিল, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের আদব ও সম্মান অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ধারণা-কল্পনা এবং মূর্তিপূজার বেদী ও জুয়ার তীরের বেড়াভাল ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং আরব উপদ্বীপকে শয়তানের পূজা থেকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনি এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে ইরশাদ হলো- اليوم يئس الخ -তাফসীরে উসমানী ১/৪৯০

মোটকথা তখন পুরো আরব উপদ্বীপ মুসলমানদের করতলগত হয়ে গেছে। সেখানে কাফেরদের সকল দর্প পূর্ণ চূর্ণ হয়ে গিয়ে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এই ভিত্তির উপর ভর করে পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে তা আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও পরবর্তী খলীফা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেননি; কিন্তু ইঙ্গিত ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নামায পড়ানোর দায়িত্ব উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধীকে আকবর হযরত আবু বকর রাযি.-কে দিয়েছিলেন। এছাড়া বলেছিলেন, নেতা কুরাইশ থেকে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাকীফায়ে বনু সায়েদায় হযরত উমর রাযি. হযরত আবু বকর রাযি.-এর সেই ইমামতির কথা উল্লেখ করেই সকলকে তাঁর খেলাফতের উপর একমত করেছিলেন। এভাবে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ হয়ে যায়। বিস্তারিত, তারীখে উম্মতে মুসলিমা (১/৩৯৬)।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো নববী যুগেই দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তা আরও বিস্তৃতি ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। বর্তমান যুগেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তার সুফল লাভ করার জন্য আমাদের মদীনার সেই পথ ও পন্থা অনুসরণ করা আবশ্যিক। এজন্য মদীনার ইসলাম ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে আমাদের গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন। মদীনার শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তা শুধু শাসনক্ষমতা নয় বরং আদর্শের প্রতিষ্ঠা; জবরদস্তি নয় বরং দাওয়াতের ভিত্তিতে ছিলো এর প্রধান উপকরণ। আদর্শ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এক সময় শক্তি সংরক্ষণ এবং যথা সময়ে

শক্তির যথার্থ প্রয়োগ এই ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমরা সকল দিককে বিস্তারিত আলোচনায় আনতে পারিনি। মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অন্য কোনো পরিসরে আল্লাহ তা'আলা চাইলে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। ওমা তাউফীকী ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ, ওয়াআলা আলিহী ওয়াআসহাবিহী ওয়াসাল্লিম, আমীন, ইয়া রাক্বাল আলামীন।

দিগন্তের ডাকে...

জুনাইদ আহমাদ শিবলী*

আমার জীবনে খুব বেশি স্বপ্ন দেখার সুযোগ হয়নি। কারণ আমি জানতাম, স্বপ্ন দেখা মানেই স্বপ্ন ভঙ্গের যাতনা সহ্য করা। স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভঙ্গ যেন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বপ্নের সুন্দর শুভ পায়রাগুলো উড়তে শুরু করা মানেই একটু পরে মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া। তবে ছোট সময় থেকেই কিছু স্বপ্ন আমার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলো। সেই শৈশব থেকেই। কত চেষ্টা করেছি সেগুলোকে মুছে ফেলতে, অংকুরেই হৃদয়ের বেলে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে! কিন্তু পারিনি। আন্তে আন্তে স্বপ্নগুলো বড় হয়েছে, ডাল-পালা ছড়িয়ে শেকড় গেড়ে নিজের ভীতকে মজবুত করেছে! তাদের সামনে আমি ছিলাম নির্বিকার! চাইলেও পারিনি বাধা দিতে। কেমন যেন মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবতাম, থাক না! খুব আহামরি কিছু তো আর নয়! ভারি দেয়াল বেয়ে কত আগাছাই তো বেড়ে উঠে, তা বেড়ে ফেলে দিয়ে আমার কী লাভ! তাতে আর কিছু না হোক, শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা তো পেতে হবে না!

মানুষের চিরাচরিত একটা স্বভাব হচ্ছে, সে তার আশপাশের পরিবেশ থেকে খুবই প্রভাবিত হয়। সেটা তার জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতে, সে প্রভাবিত হবেই। দেখা যায়, আমাদের চারপাশে যত আবিষ্কার আছে, প্রত্যেকটিতেই তার চারপাশের বস্তু থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই উদ্ভাবন করে। সেটা নৌযান, আকাশযান বা স্থলযানই হোক না কেন, তার উদ্ভাবনের পেছনের গল্প একটাই—প্রকৃতি।

খুব স্বল্প ও সীমিত পরিসরে বেড়ে উঠা এই আমি! আমার চারপাশটা ছিলো খুবই সংকীর্ণ। টুকরো আকাশে এক ফালি চাঁদ, গুটিকয়েক তারা, এই ছিলো আমার পৃথিবী। আর ছিলো জানালার ফাঁক গলে আসা লালচে রোদের বিচিত্র নকশা! মেঝেয় বসে কল্পনার রথে চড়ে এই নকশা ধরে কত যে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সেই ছোট বয়সে আমি পরিচিত হয়েছিলাম একটি লাউডগার সঙ্গে! দীপ্ত এক স্থাপনিক লাউডগা! স্বপ্নকে ছোঁয়ার কী অদম্য স্পৃহা তার মধ্যে! অবাক হয়েছিলাম, মুগ্ধ ও শিহরিত হয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম, আমিও স্বপ্ন দেখবো! লাউডগার স্বপ্ন! দিগন্ত ছোঁয়ার এক অদম্য স্বপ্ন!!

সব গাছ আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখলেও লাউডগা স্বপ্ন দেখে দিগন্তের। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর ভিটেয় লাগানো লাউডগা শুরু করে তার স্বপ্ন যাত্রা। ভিটে পেরিয়ে আইল ছাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় দিগন্তের পানে। অবাক হয়ে ভাবতাম! তার যাত্রার শেষ কোথায়? প্রবল ইচ্ছে হতো, প্রচণ্ড কৌতূহল আমাকে আলোড়িত করতো—কী আছে ঐ দিগন্তে! কী আকর্ষণ আছে দিগন্তের গায়ে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছের কালচে সারির ওপাশে!! ছুটে যেতে চাইতাম; পরক্ষণেই মুখ খুবড়ে পড়ে যেতাম। মনে পড়ে যেত, আমি ভিটেয় লাগানো লাউডগার মতন স্বাধীন নই, আমি হল্যাম মাচায় লাগানো পরাধীন লাউডগা, স্বপ্ন পূরণের অদম্য বাসনায় যা মাচা থেকে লাফিয়ে পড়ে অসীম হতাশায় শূন্যে ঝুলতে থাকে।

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া। স্বপ্ন বুনন ও স্বপ্ন পূরণের এক আলোকিত অভয়ারণ্য। ভর্তি হওয়ার পর পরই জানতে পারি যে এখান থেকে এক বছর অন্তর ইফতার ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ একটি ইলমী সফরের আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন বড় ও প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলো যিয়ারতসহ দেশের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থানগুলো রয়েছে, সেগুলো পরিদর্শন করানো হয়। ব্যস! শুরু হয়ে গেলো নতুন করে স্বপ্ন দেখা। অপেক্ষায় অপেক্ষায় দীর্ঘ এক বছর অতিবাহিত হয়ে এখন দ্বিতীয় বছর। স্বপ্ন ছোঁয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো! আবার সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সইতে হবে না তো! দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ছুটি শেষে মাদরাসায় আসলাম। টেবিলের এপাশের জীবনের শেষ দিনগুলো পার করছি। সাথী ভাইদের মাঝে সফরের জোর গুঞ্জন চলছে, কিন্তু উপর থেকে কোনো ইশারা আসছে না। কেউ শঙ্কায় আবার কেউ আশঙ্কায় নিজেকেই নিজে গুধাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত হবে তো? উত্তর দেওয়ার কেউ নেই!

সব কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটিয়ে একদিন মুদীর সাহেব হুযূর আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় যেতে আগ্রহী? দুইটা মত আসলো। সিলেট আর কক্সবাজার। উভয় পক্ষের পালা প্রথমে সমান সমান থাকলেও এক পর্যায়ে কক্সবাজারের পালা ভারি হয়ে গেলে সেখানে যাওয়ার ফায়সালাই চূড়ান্ত হলো। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট চার দিনের সফর। পথে বরাবরের মত এবারও বড় বড় কয়েকটা মাদরাসা যিয়ারত হবে। এ যেন হঠাৎ আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া! পাঁচজন উস্তাযসহ ইফতার দুই বর্ষ মিলিয়ে আমাদের অভিযাত্রী সংখ্যা দাঁড়ালো উনিশজনে। এই আনন্দের মাঝেও সবার

* ইফতা কোর্স সমাপনকারী শিক্ষার্থী, ১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষ; মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

ভেতর একটা হাহাকার কাজ করছিলো, আমরা আমাদের মুরুব্বী উস্তাযদের মধ্যে কাউকে এ সফরে পাচ্ছি না! মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব হুযুরকে দরসে আবার অনুরোধ করলাম। হুযূর খুব সুন্দর ও বিনয়ের সঙ্গে, হাসিমুখে সামনের ওমরার দীর্ঘ জার্নি ও হাঁটু ব্যথার ওষুধ পেশ করলেন। কোনো দরকার ছিলো না, তবুও ওষুধ পেশ করলেন। মুফ্ফ হলাম! পরে আমরা যেন আবার কষ্ট না পাই সেদিক খেয়াল করে বললেন, আপনারা জান, আমি এখান থেকেই আপনাদের খোঁজ নিবো! বিমুফ্ফ হলাম! দিলটা ভরে গেলো। আসলে হুযূরের হাসিতে যেমন প্রশ্রয় ঝরে পড়ে, হুযূরের কথাও যেন কানে ফোঁটা ফোঁটা মধু বর্ষণ করে। হুযূরের কাছ থেকে এ দুটিই যদি অর্জন করতে পারি, তাহলে আর কিছু না হোক অন্তত এতটুকু বলতে পারবো যে হুযূরের কাছ থেকে এ গুণ দুটো অর্জন করতে পেরেছি।



আগামীকাল আল্লাহ চাহেতো আমাদের সফর শুরু হবে। আজ সোমবার এশার নামাযের পর নাযেম সাহেব হুযূর আমাদের সফর বিষয়ক কিছু দিকনির্দেশনা দিলেন। বললেন: আমাদের সফর যেন নিছক প্রচলিত Study Tour শিক্ষাসফর না হয়। আমরা যেন এই সফর থেকে কিছু অর্জন করতে পারি সেই চিন্তা করতে হবে। সুতরাং আমরা যেহেতু কক্সবাজার যাবো, আর সেখানে সাগর, পাহাড় ইত্যাদি আছে। তাই আমরা এখন থেকেই সাগর ও পাহাড় সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। পরে যখন এগুলোর সম্মুখীন হবো, তখন যেন এ আয়াতগুলো যেহেতু আসে এবং এর হাকীকত ও সৃষ্টির পিছনের মালিককে চিনতে পারি...। এরকম আরো কিছু মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক কথা বলে আমাদের রাতেই প্রস্তুতি সেরে ফেলতে বললেন। আগামীকাল সকাল ছয়টায় গাড়ি আসবে। এর আগেই যেন আমরা প্রয়োজনীয় সামানা গুছিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকি।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত। সবার মাঝে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভোর চারটার পরে আর কেউ বিছানায় নেই। উঠে সবাই তাহাজ্জুদ পড়ে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সারা দিনের ধকল, তাই ফাঁক বুঝে অনেকে গোছলও সেড়ে নিলো। ছয়টার আগে নামায পড়ে গাড়ির অপেক্ষা করছি। এখন শুধু গাড়ি আসার পালা। কিন্তু বাংলাদেশ বলে কথা! ছয়টার গাড়ি...! এমন সময় আল্লাহর কি ইচ্ছা! উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা সাইদুর রহমান সাহেবের কথা মনে হলো। গতকাল দরসে তিনি মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের সফরের হালাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, হুযূর যখন কোনো সফরে বের হতেন, তখন এর জন্য আলাদা প্রস্তুতির জন্য সময়

নষ্ট করতেন না; বরং হুযূর সরাসরি কাজ থেকে উঠে সফরে যেতেন আবার ফিরে এসে সরাসরি কাজে বসে যেতেন। চিন্তাটা মনে আসতেই সামনে জাওয়াহিরুল ফিকহ ছিলো, নিয়ে বসে গেলাম। আমরা তো আর এত আঁলা তাবকার কাজ করতে পারবো না, তবে তাশাক্বুহ তো করতে পারি! হয়তো আল্লাহ এই উসিলায়...

একটু পরেই মুদীর সাহেব হুযূর বললেন, সবাই নিচে গিয়ে দাঁড়াও, গাড়ি কাছাকাছি চলে এসেছে। নিচে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে গাড়ির দেখা পেলাম। সুন্দর ছিমছাম দুটো হাইএইচ। এক গাড়িতে মুদীর সাহেব হুযূর ও মাওলানা মুছান্না সাহেব হুযূর; সঙ্গে ইফতা দ্বিতীয় বর্ষের তালিবুল ইলম ভাইয়েরা, আর অপর গাড়িতে নাযেম সাহেব হুযূর, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব ও হাফেয ওমর ফারুক সাহেব। সঙ্গে ইফতার প্রথম বর্ষের তালিবুল ইলম ভায়েরা। এই মোট উনিশ জনের ছোট কাফেলা। মুদীর সাহেব হুযূর বললেন, গাড়ির পেছনে যারা বসবে, তাদের একটু ই-সার করে বসতে হবে। হিম্মত করে বসে গেলাম। হুযূর খুশি হলেন। প্রতি গাড়িতেই মাঁহাদের পরিচয় সূচক কাগজ লাগানো হলো। সামনে আরবীতে পিছনে বাংলায়। অতঃপর মুদীর সাহেব হুযূর গাড়িতে বসার পর যখন গাড়ির চাকা সচল হলো, ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তখন বাজে ৭.১৬ টা।

গাড়ি চল্লিশ ফিট (রাস্তা) পার হয়ে মেইন রোডে উঠতেই মুদীর সাহেব হুযূর সফর বিষয়ক মুযাকারা শুরু করলেন। সফরের যেসব সুনাত ও দু'আয়ে মাসনূন রয়েছে, একে একে সবার কাছ থেকে শুনতে লাগলেন। এই মুযাকারা যে আমার জন্য কত মুফীদ হয়েছে, পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি। সফরে তো বটেই, পরবর্তীতেও যখন বাসায় আসা যাওয়ার পথে গাড়িতে উঠতে হয়েছে, তখনই হুযূরের এই মুযাকারার কথা স্মরণ হয়েছে এবং এর উসিলায় সুনাতগুলোর উপর আমল করার তাউফীক হয়েছে। জাযাহুল্লাহ আহসানাল জাযা। আসলে আল্লাহওয়ালা ও মুরুব্বীদের সঙ্গে সফরের মজাটাই এখানে। তাদের নিগরানী ও তত্ত্বাবধানে যে কাজই করা হোক, সেটাই প্রাণবন্ত হয়ে যায়। বহু আগে একটা আরবী কবিতা পড়েছিলাম। যার অর্থ মোটামোটি এরকম— পরিবেশনকারীর চমকে পানশালাও নতুন ও মজাদার হয়ে ওঠে। আমাদের গাড়ির ভেতরেও চলতে লাগলো দরস ও তাদরীসের অনুপম সবক। হুযূর সফরের যত মাসনূন দু'আ আছে, সেগুলোর অন্তর্নিহিত মর্মগুলো খুলে খুলে বয়ান করছিলেন। যতই শুনছি, ততই রোমাঞ্চিত হচ্ছি! এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি! সফর তো আরও করা হয়েছে, এরকম লায়্যাত তো আর কখনো পাইনি!

এই সকালেও ঢাকার চেহারা অপরিবর্তিত। ধূলো একটু কম হলেও যানজট তার পুরো শক্তি নিয়ে রাস্তায় হামলে পড়েছে। ঢাকার এই চেহারাটা দেখতে দেখতে বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছি। এক সময় মায়া লাগতো! কিন্তু এখন কেন যেন মনে হয়, এ রাস্তাটাকে জ্যামেই মানায়। এর বিপরীত চেহারাটা তার সাথে কেন যেন মানায় না।

যাত্রাবাড়ি মেয়র হানিফ উড়াল সেতু পার হয়েছি। সকালের ভেজা ভেজা আমেজটা এখনো টিকে আছে। একটু দূরে তাকালেই দেখা যাচ্ছে সবুজের উপর কুয়াশার একটা পুরু আস্তরণ। মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা। মনে হচ্ছে, খেয়ালের বশে কেউ যেন সবুজের উপর মিহি তুষার মাখা রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে! দৃশ্যটা বেশ উপভোগ্য। গাড়ির ভেতরে তখন 'ইশ্ক কি রাঙ মে রাঙ যাও মেরে ইয়ার'-এর সুরের ঢেউ চলছে! বাইরে শ্রষ্টার তুলির আঁচড় আর ভেতরে সৃষ্টির রঙ, আর আমাদের অবস্থা রঙতুলিতে মিলেমিশে একাকার- ইশ্ক কি রাঙ মে রাঙ যাও মেরে ইয়ার।

ইশকে নবী ও হুসেইন খোদার দোলায় দুলতে দুলতে যখন বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁ এসে পৌঁছলাম, তখনই ঘটলো ছন্দপতন! আমাদের দ্বিতীয় গাড়িটা (যেটা সবসময় আমাদের পিছনে থাকার কথা ছিলো) একটা ট্রাকের সাথে টঙ্কর লেগে পিছনের লাইটটা খুলে গেলো, একটু ভেঙ্গেছেও বটে! সেটা হাইওয়ে হওয়ায় সেখান থেকে আরও কিছুটা সামনে গিয়ে একটা পাম্প কাম ট্রাক স্টেশনে গিয়ে ট্রাক ড্রাইভারকে ধরা হলো। অনেক দহরম মহরম হওয়ার পরও তার কাছ থেকে কোনো জরিমানা আমাদের ড্রাইভার আদায় করতে পারলো না। তার কাছ থেকে যে কিছু আদায় করা যাবে না, সে কথা আগেই আমাদের এক সাথী বলে দিয়েছিল। তাদের থেকে জরিমানা আদায় করাটা রীতিমত অসাধ্য সাধনই বলা চলে। যাই হোক, এদিকে আমাদের বিলম্বও হচ্ছে। এজন্য সেখানে সময় নষ্ট না করে সামনে অগ্রসর হলাম। রাস্তার সময় হয়ে এলো। একটা ভালো হোটেল দেখে সফরের প্রথম যাত্রাবিরতি দেওয়া হলো।



হোটেল মিয়ামি। এ নামের সাথে আমি পূর্ব-পরিচিত ছিলাম। তবে এ কোম্পানির যে হোটেল ব্যবসাও আছে, তা জানতাম না। হোটেলটা মোটামোটি সুন্দর! বেশ ছিমছাম ও গোছালো পরিবেশ। আর খাবার পরিবেশকদের আচরণও ভদ্র ও মার্জিত। হাতে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিয়ে টেবিলে এসে বসলাম। মুদীর সাহেব হুযূর সফর ও এর আদাব সম্পর্কে খুবই মুফীদ আলোচনা করছেন। তিনি বললেন- প্রফেসর হযরতও এই হোটলে যাত্রাবিরতি

দিয়েছেন। আর প্রফেসর হযরতের সঙ্গে সফরের মজাই অন্যরকম। হুযূর এখানে واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أي مسني الشيطان بنصب وعذاب থেকে পড়া শুনতেন। তারপর আমাদের এক সাথীকে এখান থেকে পড়তে বলে এই আয়াতের মুখতাসার তাফসীরও করে শুনালেন। এরপর হুযূর হঠাৎ আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله থেকে পড়! প্রফেসর হযরত এখান থেকেও পড়া শুনতেন। ঘাবড়ে গেলাম! তবুও আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়া শুরু করলাম। হুযূর আগের মতই তাফসীর করলেন। ইতোমধ্যে টেবিলে নাস্তা চলে আসায় হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত ছিলো। হুযূর যখন আলোচনা করছিলেন, খেয়াল করলাম পাশের টেবিলের লোকজন চুপ করে আমাদের দিকে লক্ষ্য করছে। হোটেলের ক্যাশিয়ার নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুযূরের কথা শুনছেন। আর খাবার পরিবেশকরাও কাজের ফাঁকে এদিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে। দেখে ভালো লাগলো। বরাবরের মত আবারও মনে হলো, আমাদের দেশের মানুষদের হৃদয়গুলো ইলমী মেহনতের জন্য এখনো বেশ উর্বর। যদি সময়মত ও পরিমিত মেহনত করা যায়, তাহলে এদের থেকে এখনো ভালো কিছু আশা করা যায়।

ছিমছাম নাশতা হলো। টুকরো করে কাটা পরটা সঙ্গে বুটের ডাল, সবজি ও চিকন করে কাটা আলু ভাজি। পরিবেশনটা দারুণ! সবশেষে হাত ধোয়ার জন্য সিরামিকের পেয়ালায় কুসুম গরম পানি। উপরে দেখলাম চিকন করে কাটা লেবুর টুকরোও ভাসছে! হাত ধোয়ানোর এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো।

রাস্তা মোটামোটি ফাঁকা। মসৃণ সড়কে গাড়ি বেশ সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলছে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য জামিয়া রশীদিয়া ফেনী। বিভিন্ন মাদরাসার ডায়েরিতে এই মাদরাসার ছবি দেখেছি- বেশ সুন্দর! এই মাদরাসায় পড়ুয়া অনেক ছাত্র ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। রাহমানিয়ায় তাদের সঙ্গে দাওয়া পড়েছি। অনেক গল্পও শুনেছি এই মাদরাসা সম্পর্কে। ইচ্ছা জেগেছিলো যদি কখনো সুযোগ হয়, একবার এখান থেকে ঘুরে যাবো। মা'হাদের উসিলায় এই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। বসে বসে এসব ভাবছিলাম, সেই সঙ্গে চলছিলো 'মেরি উল্ফাত মাদীনে সে ইউইহি নেহি...' নববী ইশকের আবেগ ঝরানো নাত। হঠাৎ মুদীর সাহেবের প্রশ্নে মোহভঙ্গ হলো- গাড়িতে উঠে দু'আ পড়েছো কে কে? বিপাকে পড়ে গেলাম! অপ্রস্তুত অবস্থায় কিছু বলবো বলবো করছি, এর মধ্যেই হুযূর বলে ফেললেন, যারা পড়নি এখনই পড়ে নাও! আপ্ত হলাম! হুযূর পারতেন একটু তিরস্কার করতে, এত মুযাকারার পরও সুন্নাতগুলো আমলে আসলো না বলে ধমকও দিতে পারতেন। কিন্তু তার কিছুই নয়! বরং

আবারও পড়ার তাগীদ দিলেন। বড়দের সঙ্গে সফরের আসল ফায়দাই এখানে। তাঁরা পদে পদে, সময়ে সময়ে অনেক দামী দামী মুক্তা বিলিয়ে যান, কিন্তু আমাদের নেওয়ার পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে নিতে পারি না, অযথাই গাফেল হয়ে বসে থাকি। আর এখানেই ব্যত্যয় ঘটে।

গাড়ি চলছে তুমুল গতিতে। একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে আসা-যাওয়ার রাস্তার মাঝে রোড ডিভাইডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিশাল বিশাল ঝিল! দুই পাড়েই গাড়ি চলছে, একটা যাওয়ার আরেকটা আসার। চিন্তাটা আমার কাছে খুব সৃজনশীল বলে মনে হলো। রাস্তার প্রয়োজনে খাল ভরাট না করে খালের প্রয়োজনে রাস্তা ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে। সুন্দর!



গাড়ি এখন হাইওয়ে ছেড়ে বায়ের একটা বাই রোড দিয়ে চলছে। এটাই জামিয়া রশীদিয়ার পথ। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটা বিশাল ফটকের সামনে গাড়ি থামল। মুদীর সাহেব ঘোষণা করলেন, এটাই জামিয়া রশীদিয়া! ফটক দিয়ে ঢুকেই আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। মাশাআল্লাহ! বিশাল স্থাপনা! এখন তালিবুল ইলমদের গোসলের বিরতি চলছে—অনেকেই গোসল করছে। মাদরাসার মাঝখানে বিশাল মাঠ আর তার মাঝে একই আয়তনের শান বাঁধানো পুকুর! চারদিক থেকেই সুন্দর করে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে পুকুরের দিকে। প্রত্যেক ভবনে যাওয়ার জন্য পাকা রাস্তা করা আছে, আর রাস্তার পাশে লাগানো আছে বিভিন্ন প্রজাতের গাছ। বেগুন থেকে নিয়ে অনেক গাছই দেখলাম সেখানে।

আমরা মাদরাসার প্রশাসনিক ভবনে উঠলাম। উয়-ইত্তিজা সেরে যোহরের শুরু ওয়াভেই দুই রাকাতাত নামায কসর করে নিলাম। ইতোমধ্যে মুহতামিম সাহেব দরস শেষে অফিসে এসেছেন। আমরা ছয়ূরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। সালাম মুসাফহার পর মুদীর সাহেব ছয়ূরের অনুরোধে ছয়ূর আমাদের উদ্দেশ্যে মুখতাসার কিছু নসীহত পেশ করলেন। যার প্রতিটি বাক্যেই ছিলো জীবন চলার পথের অমূল্য পাথর। ছয়ূর বললেন—

এটা অনেক আনন্দের বিষয় যে, বর্তমানে অনেক মাদরাসায় তাখাসসুস খোলা হচ্ছে। আল্লাহর শোকর, মাশাআল্লাহ অনেক ছাত্ররা তাখাসসুস করছে, আর অনেক যাহীন ফাহীম ছাত্ররাও তাখাসসুস করছে। আনন্দের কারণ হলো, বর্তমানে এমন এক যামানা চলছে যখন দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত যাওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার! তবে আফসোসের বিষয় হলো, বহু তালিবুল ইলম তাখাসসুস করছে এমন যায়গায়, যেখানে শুধু লেখা-পড়াই

আছে; কোনো আহলুল্লাহ বা সাহিবে নিসবত আল্লাহওয়ালা নেই, যারা তাদের ইসলাহ করতে পারে! এর চেয়ে বড় আফসোসের বিষয় হলো, মাদরাসাগুলোতে তো সাহিবে নিসবত আল্লাহওয়ালা আছেন, কিন্তু ছাত্রদের এই ইচ্ছা বা অনুভূতি নেই যে, আমাদের কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার। অথচ শুধু ইলম! এটা তো মাকসূদ ছিলো না! বরং ইসলাহ করানোটাই মূল মাকসূদ। ইলম হলো এই ইসলাহের সহায়ক। ইলমের সাথে সাথে ইসলাহ থাকলে অন্তর নূরে মুনাওয়ার হয়ে যাবে। এর বিপরীতে ইলমের সাথে সাথে ইসলাহ না থাকলে সেই ইলম দ্বারা গোমরাহী ছড়াবে। এ কারণেই আজ ভালো ভালো আলেম হচ্ছে, কিন্তু তাদের দ্বারা তেমন কোনো ফায়দা হচ্ছে না। (এখানে ছয়ূর খুব সুন্দর একটা ফারসী কবিতা বলেছিলেন, যার অর্থটা মোটামোটি এ রকম) মোমবাতি চারদিকে অনেক জ্বলছে, কিন্তু তাতে অন্ধকার দূর হচ্ছে না। সুতরাং আমরা যারা তাখাসসুস করছি তারা যদি ঠিক হয়ে যাই, তাহলে অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

مولوی سدر حائے تو دنیا سدر حائے - مولوی بگر
حائے تو دنیا بگر حائے

ছয়ূর মাদরাসায় দুপুরের দস্তরখানে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিলেন। অল্প সময়ে বেশ শানদার দস্তরখানের ইত্তিজাম হয়ে গেলো। অনেক কিছুই ছিলো দস্তরখানে, ভর্তা থেকে নিয়ে গরুর গোশত পর্যন্ত। আর খাবারের সমাপ্তি পর্বে ছিলো গরুর দুধের চা! সবচেয়ে বেশি যেটা ছিলো সেটা হলো তাদের আন্তরিকতা! খাবারের স্বাদ যতক্ষণ ছিলো তো ছিলো, কিন্তু তাদের আন্তরিকতার স্বাদটা এখনো যেন দিলে লেগে আছে! আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং জান্নাতে যেন একই দস্তরখানে বসার তাউফীক দান করেন! এই দু'আ করে আমরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।



গাড়িতে বসে আছি। গন্তব্য হাটহাজারি মাদরাসা! আহমদ শফী সাহেবের হাটহাজারি! জুনায়েদ বাবুনগরী, আব্দুস সালাম চাটগামী সাহেবের হাটহাজারি! হাজারো উলামা তলাবার প্রাণের স্পন্দন এই হাটহাজারি! ফেনীর সফর রাস্তা থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ি এখন প্রশস্ত হাইওয়ে ধরে তীর বেগে এগিয়ে চলছে। আনমনে পিছনে রেখে আসা জামিয়া রশীদিয়ার কথা ভাবছিলাম। বের হওয়ার সময় একটা বিষয় চোখে পড়েছিলো। ছোট একটা দোতলা ভবনের উপর তলায় ছোট ছোট খোপ করা। জোড়ায় জোড়ায় কবুতর সেখানে উড়ে

এসে বসছে! কৌতুহল মিটানোর জন্য একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, মাদরাসা থেকেই এদের জন্য এই ঘর করে দেওয়া হয়েছে, আর এখান থেকেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়! মুগ্ধ হয়ে অনেক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। এরকম সুন্দর মানসিকতাই তো আমাদের সম্পদ! যা হারিয়ে আজ আমরা প্রায় সর্বশান্ত।

ঐ দেখো পাহাড় দেখা যায়! মুদীর সাহেবের আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়লো। তাকিয়ে দেখি একটু দূরে সুউচ্চ পাহাড়ের সারি! সেখানে হয়তো এ ভর দুপুরেও কুয়াশা দূর হয়নি। তাই কেমন যেন আবছা আবছা দেখা যায়। পাহাড়গুলো সুন্দর ঢেউ খেলানো এবং ছোট, বড়, আরও বড় এই অংকে সাজানো! সম্ভবত মাটির পাহাড়। খেয়াল করলাম, হঠাৎ হঠাৎ তার লাল গাত্র খুব সন্তুষ্টভাবে উঁকি দিয়ে আবার সবুজের আড়ালে হাড়িয়ে যাচ্ছে। হুয়ুর বললেন, এই পাহাড়ের উপর দিয়েই তোমাদের হাটহাজারি নিয়ে যাবো! শিহরিত হলাম! এত উঁচু পাহাড়ে এই গাড়ির চাকা চলবে তো! আমার আশঙ্কাকে বুদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গাড়ি সত্যিই উঁচু পথ বেয়ে উপরে উঠা শুরু করলো! মুদীর সাহেব হুয়ুর আওয়াজ করে ‘আল্লাহ আকবার’ বলায় উপরে উঠার দু’আর কথা স্মরণ হলো। মনে মনে হুয়ুরকে শুকরিয়া জানিয়ে অপরাধ সৃষ্টির শ্রষ্টাকে স্মরণ করে পড়া শুরু করলাম— আল্লাহ আকবার! আর সাথে সাথেই আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর এই সৃষ্টির আরও কাছে এসে তৃপ্তি সহকারে সৃষ্টির সৌন্দর্যে অবগাহন করার সুযোগ করে দিলেন!

পাহাড়ের একটা স্থানে উঁচু উঁচু দুইটা টিলাকে ঘিরে বেশ কিছু যায়গা নিয়ে স্বল্প পরিসরে একটা পার্কের আবহ তৈরি করা হয়েছে। গাড়িতে তো সবই দ্রুত বেগে চলমান ছবি, তবে সেখান থেকে এই পাহাড়ি অঞ্চলের অনেকটা অংশ স্থির হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়! আমাদের ড্রাইভার সম্ভবত এখানে আগেও এসেছে। সে এখান থেকে ঘুরে আসতে পরামর্শ দিলো। মুদীর সাহেব হুয়ুর খুবই মুখতাসার সময়ের জন্য সেখান থেকে ঘুরে আসার অনুমতি দিলেন। সামনেই সংকীর্ণ প্রবেশ পথ। কাউন্টারে দুইজন সেনাবাহিনীর যুবক দাঁড়িয়ে। দেখে ভালো লাগলো! মাথা পিছু দশ টাকায় টিকেট সংগ্রহ করে প্রবেশ করলাম। ভেতরে বেশ সুন্দর মনোরম পরিবেশ! মানুষের ভীড় কম থাকায় জায়গাটা আমাদের জন্য মুনাসিব ছিলো। প্রথমে সবাই মিলে উঠলাম দুই টিলার মধ্যে ছোটটায়। নিজেকে কেমন অভিযাত্রী অভিযাত্রী লাগছে! এবার দ্বিতীয়টায় উঠার পালা। আগেরটার তুলনায় এটা একটু বেশি উঁচু। উঠতে বেশ বেগ পেতে হলো! পাহাড়ী অঞ্চলের বেশ খানিকটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। একেবারে উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে চমকিত হলাম! সোজা সামনে তাকালে দৃষ্টি

একটু দূরের পাহাড়ের পিঠে গিয়ে থমকে যায়! সাহস বেড়ে গেলো, ওহো! ঐ চূড়াটায় উঠতে পারলে ভালো হতো, প্রকৃতিটা আরেকটু প্রশস্তভাবে দেখা যেত। পরক্ষণে বুকের অনবরত উঠানামা দেখে অনেক কষ্টে সঞ্চিষ্ট সাহসটা আর ধোপে টিকল না! বাধ্য ছেলের মত সিঁড়ির পাকা ধাপ বেয়ে মুদীর সাহেব হুয়ুরের পিছু পিছু সোজা গাড়িতে উঠলাম। জানালা দিয়ে তখনো সেনাবাহিনীর দুই তরুণকে দেখা যাচ্ছিল। সবাইকে কালো গ্লাসের এপার থেকে তাদের উদ্দেশ্যে সামরিক কায়দায় ছোট খাটো জবরদস্ত একটা স্যালুট ঠুকলাম! তাজ্জব বনে গেলাম, দেখি তারা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে! কালো গ্লাসের ওপার থেকেও কি দেখা যায়?!!

✧ ✧ ✧

ব্যস্ত চট্টখামের অতি ব্যস্ত রাস্তায় আটকে আছি। গাড়ির ভেতরে চলছে নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম— ...এইসে খুশবু চামান কে ফুলোমে কাহাঁ, জো নাবী কী পাসিনে মে মাওজুদ হয়...।

অনেক অলি গলি পার হয়ে আমাদের গাড়ি হাটহাজারি মাদরাসার মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো। গাড়ি থেকে নেমে হাজত সেরে জামাআতের সাথে আসরের নামায কসর করে নিলাম। জানতে পারলাম, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব এখন মাদরাসায় নেই। অবশেষে একজন তালিবুল ইলম আমাদেরকে মুহতামিম সাহেবের কামরা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে তাকে শুকরিয়া জানিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। হুয়ুরের খাদেম আমাদের বললেন, এখন হুয়ুর তাঁর কক্ষে আছেন। শুনে খুব ভালো লাগলো। হুয়ুর সাথিদের ডেকে আনতে বললেন। সবাই মুহতামিম সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলাম। হুয়ুরকে আগে কখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এই প্রথম দেখলাম! দেখেই ভেতরে কেমন যেন একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিল। সালাম মুসাফাহার পর হুয়ুরের সামনে বসে গেলাম। মুদীর সাহেব হুয়ুর আমাদের মাদরাসার পরিচয় ও আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য অবহিত করে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত পেশ করার অনুরোধ জানানলেন! হুয়ুর বললেন—

আপনারা মাশাআল্লাহ সবাই ইফতা পড়ছেন। মাসআলা লেখার পূর্বে চিন্তা করবে, এই মাসআলাটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, নাকি হাদীস দ্বারা? আর কুরআন দ্বারা হলে কোন্ আয়াত দ্বারা? আর হাদীস দ্বারা হলে কোন্ হাদীস দ্বারা? পরবর্তীতে দেখতে হবে, আয়াত বা হাদীস দ্বারা মাসআলাটি কি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে? আম হিসেবে নাকি খাস হিসেবে? নাকি মুতলাক বা মুকাইয়াদ

হিসেবে? এরপর খেয়াল করতে হবে, তার অর্থ কী? হাকীকত নাকি মাজায়, মুশতারাক নাকি মুআওয়াল? এই বিষয়গুলো জানার পর মাসআলা লেখা শুরু করবে! তবে সাবধান! মাসআলা না বুঝে কখনো লিখবে না! আর অনেক চেষ্টার পরও যদি মাসআলা বুঝে না আসে, তাহলে শেষ রাতে মালিকের দরবারে দাড়িয়ে যাবে! তাঁর কাছ থেকে মাসআলা হল্ করার ব্যবস্থা করবে! আর লোকজনকে যে মাসআলা বলবে, সে মাসআলার উপর নিজেও আমল শুরু করবে! তাহলে দেখবে! এই মাসআলা একেবারে তোমার ভেতরে ফিট হয়ে যাবে। যার দরুণ এরকম মাসআলা আর কখনো সামনে আসলে নিজের আমল থেকেই ফাতওয়া দিতে পারবে...।

মাগরিবের আযান হয়ে গেলো। হুযূরের সাথেই নামায আদায় করে নিলাম। নামাযের পর ছিলো আরেক সৌভাগ্যের পালা! মুদীর সাহেব হুযূরের অনুরোধে ইয়াহয়া সাহেব আমাদেরকে বুখারী শরীফ থেকে একটা হাদীস 'কিরাআতুত তিলমীয আলাশ শায়খ'-এর মাধ্যমে তিনটা হাদীস বর্ণনার সনদ প্রদান করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই সফরে অনেকগুলো বড় বড় নেয়ামতের মধ্যে এই নেয়ামতটা ছিলো অনন্য! হুযূর সনদ প্রদান শেষে আমাদেরকেও হুযূরের থেকে রেওয়াজ করার ইজাযত দিলেন! তবে এ-ও বলে দিলেন যে, بشرط فهمه এ যেন নূরুন আলা নূর! এই অভিব্যক্তিটা বাংলায় বললে কী বলা যেত? সোনায সোহাগা! কিন্তু কথাটা কেমন যেন এরকম ক্ষেত্রে মানায় না। হুযূর আমাদেরকে বিভিন্ন নসীহত করছিলেন। হালকা নাস্তার আপ্যায়নও চলছিলো। হুযূর যেন আমাদের কাছে পেয়ে খুব হালাতে চলে এসেছেন! ছাড়তেই চাচ্ছেন না! অবশেষে আমাদের সময়ের দিকে লক্ষ করে হুযূর মন না চাওয়া বিদায় দিলেন। আমাদেরও কেন যেন মনে হচ্ছিলো, আরও একটু বসি! আর কি আসা হবে? মন ভরে হুযূরকে আরও কিছুক্ষণ দেখি! কিন্তু আমরা ছিলাম সময়ের জালে আবদ্ধ! বিধায় এক পর্যায়ে এই মোবারক মজলিস ছেড়ে ভগ্ন হৃদয়ে উঠে আসতে হলো।

(আজ এ সফরনামা যখন ছাপা হচ্ছে তখন আমাদের এই মুরব্বী আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন। -সম্পাদক)

এটা জামিয়ার মাকবারা। মাকবারাটা খুবই দামী! যুগের অনেকগুলো মূল্যবান মোতি আমরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এখানে আমানত রেখেছি! আমি সরাসরি আহমাদ শাফী রহ., আব্দুস সালাম চাটগামী রহ.-কে দেখিনি। (মা'হাদের বিগত সফরগুলোতে মা'হাদের ত্বালাবাগণ তাঁদের সান্নিধ্য, দু'আ ও হাদিয়া লাভের

সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসীব করুন। আমীন। -সম্পাদক) তবে কয়েক বছর আগে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-কে রাহমানিয়ায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। হুযূর আজ যিন্দেগীর কঠিন সব দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে অনেক প্রিয় মানুষের অপ্রিয় কাজের সাক্ষী হয়ে এখানে বিশ্রাম করছেন। সকলে মিলে তাদের কবরে সূরা ফাতেহার নযরানা পেশ করলাম। প্রয়োজন সেরে যখন গাড়িতে উঠি, উপরে দাওয়ায়ে হাদীসের কামরা থেকে তখন ভেসে আসছিলো হৃদয় শীতল করা 'ওয়াবিহী ক্বালা হাদাসানা...।

◇ ◇ ◇

'তুমি বাঁচাও তোমার জাতি, তুমি সাজাও তোমার দেশ...' মুহিব খানের সুরের তালে তালে আমরা চলছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে- পটিয়া মাদরাসার উদ্দেশ্যে! বাংলাদেশের আরেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী এ মাদরাসাটি। রাতের রাস্তায় তেমন কোনো সৌন্দর্য চোখে পড়ছে না। তাই বলে যে রাতের মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই তা কিন্তু নয়! আসলে প্রকৃতি অতি স্বাধীনচেতা ও অতি আত্মর্যাদাশীল! সে দিন হোক আর রাত, নিজের মত করে নিজেই সাজাবে! তা তোমার চোখ দেখুক আর না দেখুক! তার কোলে বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে তাকে আমরা যতই কলুষিত করি, দিন শেষে কিন্তু আসমানের দান শিশির ঠিকই ঝরে! পথে ঘাটে অযথা বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে তার সৌন্দর্যকে যতই স্তান করার চেষ্টা করি, ঝোঁপ ঝাড়ে কিন্তু যমিনের তারা জোনাকি এখনো জ্বলে!

মসৃণ পথে গাড়ির সাবলীল চলাটা বেশ উপভোগ করছি। হাটহাজারি থেকে গাড়িতে উঠার আগে বিস্কুট, কলা, চিপস ইত্যাদি কিনে নিয়েছিলাম। হুযূরের অনুমতি নিয়ে সেগুলো বন্টন করলাম। চলতে চলতে মুখ চালাতে খুব খারাপ লাগছে না। ব্যাপারটা উপভোগ্য। ইতোমধ্যে মুদীর সাহেব হুযূর মুফতী ইহইয়া সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া সনদ তিনটার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শুরুটা করলেন সবার পিছনে বসা আমাকে দিয়ে। কলার খোসাটা খুব যত্ন করে ছাড়িয়ে প্রথম গ্রাসটা সবেমাত্র মুখে পুরেছি। হাঁসফাঁস করে তাড়াতাড়ি বাকি অংশটা পেটে চালান করে পাশে বসা সাথিকে চমকে দিলাম। তার বড় করে রাখা চোখকে উপেক্ষা করে অনেক কষ্টে সনদগুলো বয়ান করলাম।

গাড়ির ভেতরের পরিবেশটা ধীরে ধীরে কেমন যেন শান্ত হয়ে আসছে। বুঝলাম, সফরের ক্লান্তি খুবই সন্তপ্তণে আমাদের গ্রাস করা শুরু করেছে। আমি আলবৎ বলতে পারি, এখন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি- কী ভাই! ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? বলবে- কি মনে হয় মিয়া! আমরা কি আপনার মতন...! ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। আসলে আমরা আমাদের দুর্বলতা প্রকাশে মোটেই প্রস্তুত নই! আমরা

বাস্তবেই অনেক দুর্বল। বাস্তবতাটা যদি কেউ আমাদের ধরিয়েও দেয়, তবুও সহজভাবে সেটা মেনে নিতে পারি না। এটাই আমাদের সিফাত, এজন্যই আমরা মানুষ!

গাড়ি পটিয়ার রাস্তা ছেড়ে আমাদের অজান্তেই কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে যায়। আবার পিছিয়ে অলি গলি পেরিয়ে অবশেষে পটিয়া মাদরাসায় পৌঁছলাম। মাদরাসার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন লাইন পূর্ব-পশ্চিমে গিয়েছে। মাদরাসার প্রধান ফটকের সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে গেলাম। মাদরাসায় ঢুকতেই হাতের বামে একটা ছোট্ট মাকবারা। সেখানে কয়েক দিন পূর্বে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাযির হওয়া শাহ আব্দুল হালিম বুখারী রহ.-এর নামফলকটি চোখে পড়লো। এখানে ঘুমিয়ে আছেন ইলমী অঙ্গনের কয়েকজন মূল্যবান রত্ন। সূরা ফাতিহা পড়ে আহলে কুবুরদের প্রতি এর নাযরানা পেশ করলাম!

আমাদের গন্তব্য অনেক দূর! মুদীর সাহেব হযূর আমাদেরকে দশ মিনিট সময় দিলেন পুরো মাদরাসায় একটা চক্কর দিয়ে আসার জন্য। ডান পার্শ্ব দিয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ! প্রশস্ত এরিয়া। এতটাই পরিচ্ছন্ন যে, কোথাও এক টুকরো কাগজ পড়ে নেই! পূর্বের দুই মাদরাসার মত এখানেও দেখলাম, মাদরাসার মাঝখানে বিশাল শান বাঁধানো পুকুর। পুকুরের পূর্ব পাশে একটা ভবন। ভবনটার মাঝ দিয়ে দুইটা সর্পিলা সিঁড়ি আঁকাবাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। দেখতে চমৎকার!

মাদরাসার পরিধি বিশাল! হাটহাজারি, জামিয়া রশীদিয়া থেকে এই মাদরাসার পরিধি অনেক বড় মনে হলো। কয়েকটা নতুন ভবনও হচ্ছে দেখলাম। মাঠের পার্শ্বে বিশাল মসজিদ। ডানে বামে মাদরাসার ভবন আর মাঝে মাঠ। মাঠের শেষেই এখানকার সেই প্রসিদ্ধ মাকতাবা, যেটাকে উপমহাদেশের সমৃদ্ধ মাকতাবাগুলোর একটি বলা হয়। ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসলে ভালো লাগতো। কিন্তু সময় বড়ই নিষ্ঠুর— কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

মুদীর সাহেব হযূর মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা মাদরাসা পরিদর্শন শেষে হযূরের কাছে ফিরে এলে হযূর আমাদেরকে পটিয়ার আকাশে ভাসতে থাকা চাঁদটা দেখিয়ে বললেন— প্রফেসর হযরত এরকম মুহূর্তে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন। এছাড়া হযূর পটিয়া মাদরাসার একটা ঈমান জাগানিয়া ঘটনা শোনালেন। এখনকার মতন আগেও এ এলাকা এবং এর আশপাশে বিদ'আতীদের খুব উৎপাত ছিলো। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আযীযুল হক রহ. তখন একটা কাজে মাদরাসার বাইরে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় বিদ'আতীরা এসে মাদরাসায় আগুন লাগিয়ে দিলো। আগুনে পুরো মাদরাসা পুড়ে গেলো। এই খবর হযরতের কাছে

পৌঁছলে হযূর জবাবে বলেছিলেন, মাদরাসায় তাদের লাগানো আগুন যত উপরে উঠেছে, আমার মাদরাসা এর চেয়েও উপরে উঠবে! আল্লাহ্ আকবার! হযূরের কথার বাস্তব নমুনা আমাদের সামনে! আমরা সে সুউচ্চ ভবনগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি!!



রাতের নিশ্চক্ৰতার বুক চিড়ে গাড়ি এগিয়ে চলছে দুর্বীর গতিতে। ভেতরে এখন সবাই ঘুমে বিভোর! মুদীর সাহেব হযূর এই কিছুক্ষণ আগেও টুকিটাকি মুযাকারা করছিলেন। এখন হযূরও ঘুমুচ্ছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে হাইওয়ের পাশে গাড়ি থামিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম। মুরগীর গোসত, মাছ ও সাদা ভাত। সঙ্গে গুড়ো মরিচ দিয়ে কাঁচা পিয়াজের ভর্তা ও ডাল মুফতে পেয়েছিলাম! খাবারের টেবিলে আমাদের এক সাথী ভাইয়ের সরলতা ও চালকদের ছেলেমানুষী একগুয়েমী ছাড়া মোটামোটি সবই ভালো ছিলো! যাক সে কথা। গাড়ি চলছে দুর্বীর গতিতে! যাত্রীরা যেমন ছিলো তেমনই, কেউ নিদ্রায়, কেউ তন্দ্রায়। আমার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। চালক ভাইও সজাগ সতর্ক! ইচ্ছে হলো কাছে গিয়ে তাকে একটু দেখি। কিন্তু সে সুযোগ নেই। তবে মুসান্না সাহেব হযূর ঠিকই সজাগ! তিনিই কাফেলার রাহবার! তবে চালকের জন্য আমার খুব মায়্যা হলো। ঘুমের ঘোরে অচেতন এই যাত্রীদের তাকে নিয়ে যেতে হবে আখেরি মানযিলে। বাইরে যেমন, ভেতরেও তেমন অন্ধকার। চালকের মুহূর্তের অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে গাড়ি ও তার যাত্রীদের চরম বিপর্যয়। হঠাৎ নিজে নিজে প্রশ্ন করলাম— আমি বা আমরা কি কোনো গাড়ির চালক নই? আমাদেরও মুহূর্তের অসতর্কতা কি ডেকে আনতে পারে না সে গাড়ির বিপর্যয়?

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজেও ঘুমিয়ে গেলাম বলতে পারবো না। মুছান্না সাহেবের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। দেখলাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি। বাইরে বেশ ঘন কুয়াশা। গাড়ি থেকে নেমে লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। হুম! বাতাসটা বেশ ভারী! মাঝ রাতের শীতল বাতাসে স্নিগ্ধতার পরশ ছিলো, সঙ্গে ছিলো সাগরের গন্ধ! বুকটা খালি করে আবার লম্বা করে শ্বাস নিলাম! সাগর মনে হলো এখান থেকে খুব কাছে। কেন জানি মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠলো সাগরের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্যে। সাগর থেকে ভেসে আসা গন্ধে আমি যেন পেলাম মহাসাগরের ডাক! কিন্তু সফরের ক্লান্তি আর রাতের গভীরতা সাগরপাড়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।

যে হোটеле আমরা উঠলাম তার নাম 'সামস্ প্রাজা'। আর হযূররা উঠলেন হোটেল 'সিলভার বে'তে। উভয় হোটেলের মালিক একজনই। তিনি মুদীর সাহেব হযূরের মুসল্লী। হযূর মা'হাদ থেকে এদিকে আসলে এ হোটেলই

উঠেন। একটু পুরনো হলেও হোটেলটা বেশ সুন্দর! সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে একটু সামনে। আমাদের রুম দেওয়া হলো হোটেলের দ্বিতীয় তলায়। দোতলায় উঠতেই দুইটা করিডোর দুই দিকে গেছে। বাম পাশের করিডোর ধরে একটু এগোলেই আমাদের রুম। মোট তিনটা রুম নেওয়া হয়েছে। দুইটায় পাঁচ জন করে দশ জন, আর আমি-সহ তিন জনকে দেওয়া হয়েছে আরেকটা রুম। আর এই করিডোরের শেষ মাথায় সাগরের দিকে মুখ করে একটা ব্যালকনি। সাগর সম্ভবত খুব কাছেই হবে। এখান থেকেই সাগরের গর্জন শুনতে পাচ্ছি।

রাত দুইটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। এখন কি জোয়ারের সময়? সম্ভবত তাই হবে। বিচের ওখান থেকে সশব্দে গানের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। এরকম পরিবেশে এ ধরনের উপদ্রপ মন মেজাজকে একেবারে নষ্ট করে দিলো। এখনকার মানুষদের কানের পর্দা বেশ মজবুত হয়েছে মনে হয়। ইচ্ছে হলো কয়েকটা কান টেনে তাদের কানের মজবুতি পরীক্ষা করি। কিন্তু সেটা নিরাপদে শেষ নাও হতে পারে ভেবে নিজের কানই চেপে ধরলাম। সুন্দর এ রাতে হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হৃদয়ে কত ধরনের ভাবনা যে উদয় হলো, রাতের নির্জনতাকে কতটা যে আপন মনে হলো, ইচ্ছে করছে তার সবটাই কলমের আঁচড়ে কাগজের ক্যানভাসে এঁকে রাখি। কিন্তু হঠাৎ আদীব ছুঁরুর কথা মনে হলো। ছুঁরু বলেন, কলম চালনার পাশাপাশি কলমের লাগাম ধরাটাও শিখতে হবে। সবকিছু কাগজের পাতায় উঠিয়ে না রেখে নিজের জন্যও কিছু সম্পদ একান্ত আপনার করে রাখতে হবে। নয়তো কলমের পথ থেকে তুমি যেমন বিচ্যুত হবে, ভেতর থেকেও তেমনি অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়বে।



সাথী ভাইদের ডাকে ঘুম ভাঙলো। খুব সুন্দর ও প্রশান্তিময় ঘুম হলো! ইতোমধ্যে চারপাশের গুমোট অন্ধকারটা ফিকে হতে শুরু করেছে। আমাদের কামরার পাশেই ছোট্ট পরিসরের একটা নামাযঘর ছিলো। দুই জামাআতে নামায শেষ করে সাগর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমাদের আগে আরও অনেককেই দেখলাম বিচের দিকে যাচ্ছে, ফিরছেও! অবাক হলাম! ওরাও তাহলে মুসল্লী!!

ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। আমার এতদিনের পুষে রাখা স্বপ্নটা এখন পূরণের পথে। পূরণ হওয়া কয়েকটা স্বপ্নের মধ্যে এটাও शामिल হতে যাচ্ছে। এরকম সময়গুলোতে প্রিয় মানুষদের মুখগুলো খুব মনে পড়ে! আমিও এর ব্যতিক্রম নই। এই মুহূর্তে আম্মুর মুখোচ্ছবিটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বেশিরভাগ পরিবারেই সন্তানদের বেড়ে উঠার উপর সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে বাবার। বাবার জীবনের একেকটা ধাপে পা দিয়েই সন্তান তার জীবনের ধাপগুলো পার করে! বাবার ক্ষয়ে যাওয়া হাড়গুলো অবলম্বন করেই সন্তান নিজের মেরুদণ্ডে বল পায়। ক্রমেই গুঁড় হয়ে আসা বাবার চুলগুলোই

সন্তানের মাথার চুলে পুষ্টি যোগায়। কিন্তু তারপরও! মায়ের স্নেহ বা মমতায় অন্য কিছু আছে! যা অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত সন্তানদের একটা মোহে আবদ্ধ করে রাখে। একাকী মুহূর্তগুলোতে মায়েরা সন্তানের পুরো অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজ করতে থাকে। অভিমান বা জমে থাকা কষ্টগুলোকে একমাত্র মায়েরাই পারে গলিয়ে চোখ দিয়ে বের করে দিতে।

ভাই মন খারাপ! এক সাথী ভায়ের এরকম আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠলাম। কেন? মন খারাপ হবে কেন? প্রতিউত্তরে সে আমার চোখের দিকে ইশারা করলো। চোখের পাতা ফেলতেই দেখলাম দুই ফোঁটা ‘আসমানি দান’ টপ করে সাগরের নোনা পানিতে মিশে গেলো! কখন যে সাগর পাড়ে এসে পৌঁছেছি তাও বুঝতে পারিনি। একটা অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে মুদীর সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুঁরুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ছুঁরু সবাইকে সাগর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত একটা করে আয়াত শোনাতে বললেন! ডান পাশ থেকে আসতে আসতে যখন আমার পালা আসলো, দেখলাম সবাই সব আয়াতই তো শুনিয়ে ফেলেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে কোনো রকম সাগরের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন একটা আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আগে পড়ে না আসার বিষয়টি ছুঁরুর কাছে ধরা খেতে খেতে বেঁচে গেলাম!

সাগর এখন অনেকটা শান্ত। ঢেউ আসছে, তবে রাতে হোটেল থেকে যেমন আওয়াজ শুনছিলাম, তেমন তাগুব নেই। অবশ্য পরে জানতে পেরেছি, দিনের তুলনায় রাতের ঢেউয়ের আওয়াজ ভয়ঙ্কর হয়। লোকজন দুই হ্যান্ডেল বিশিষ্ট এক ধরনের বোট নিয়ে আসছে ঠেলা গাড়িতে করে। দেখতে অনেকটা মটর সাইকেলের মত! নাম- ওয়াটার বাইক। সেটা পানিতে নামিয়ে একটু দূরে চালাতে লাগলো। বেশ সুন্দর! সেটা যখন খুব স্পীডে চলে, তখন তার পিছন থেকে চিকন একটা পানির ফোয়ারা পুরো ইউটার্ন নিয়ে মাঝখানে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে পানিতে গিয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, জনপ্রতি একশ টাকা দিলে কাছ থেকে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে আনবে। আর যদি আরেকটু দূরে যেতে হয়, আরও কিছু টাকা ঢাললে সে সুযোগ আছে! চেহারায় খুবই সমঝদার একটা ভাব ফুটিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম।

গাড়িতে উঠে সোজা কলাতলি মোড়ে গিয়ে একটা হোটেলে বসলাম। এখানের আরো একটা নাম রয়েছে- ডলফিন মোড়। সামনে খুব সুন্দর পরোটা ভাজা হচ্ছে! নায়েম সাহেবের সঙ্গে আমার বসা হলো। আলহামদুলিল্লাহ! বেশ তৃপ্তির সাথে নাস্তাপর্ব শেষ করে গাড়িতে চড়ে বসলাম। গন্তব্য ঠিক হলো হিমছড়ি পাহাড়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর করা বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভে ডানে আছড়ে পড়া সাগরের ঢেউ আর বামে লাল মাটির পাহাড় রেখে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। পথে এক জায়গায় দেখলাম বিশাল বাউন্ডারি দেওয়া

এরিয়া। ভেতরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি। এর একটু পরেই দেখি দীর্ঘ একটা স্টীলের সেতু। পাহাড়ের বুক চিরে একটি নদী এখানে সাগরের সাথে মিলে গেছে। সেতুটি নদীর এপারকে ওপারের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। মুদীর সাহেব বললেন, এটা নৌবাহিনীর এলাকা। সমুদ্রের এদিকটা তারা বিভিন্ন মিশনে ব্যবহার করে থাকে।

এক জায়গায় দেখলাম, বিচে অনেকগুলো কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। আর এখানকার পানিগুলো সুগন্ধা বা অন্যান্য বিচের মত কালো নয়; গাঢ়ো নীল! দেখেই বোঝা যায় যে, এখানকার পানি বেজায় পরিষ্কার। মুদীর সাহেব বললেন, এটাই ইনানি বিচ! আমরা এই বিচের কথা আগেও শুনেছি। হুয়ের কাছে আবদার করলাম এখানে আমার জন্য। হুয়র বললেন— আরে বোকা! তোমাদেরকে এর চেয়ে সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, চলো! আমাদের অবস্থা হয়েছে জান্নাত লাভকারী ঐ বান্দার মতো, আল্লাহ তাকে আরও বড় জান্নাত দিতে চাইলেও সে বর্তমানের ছোট জান্নাত ছেড়ে নড়তে নারাজ। যখন ইনানী বিচ ছেড়ে আরও কিছুদূর এসে মুদীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক গাড়ি থেকে নামলাম। সুবহান্নাহ! এত সুন্দর দৃশ্য এখানে দেখবো বলে কল্পনাও করিনি! এখানে সমুদ্রতটের অনেকটা অংশ জুড়ে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের প্রবাল পাথর বিছানো! পাথরগুলো কালচে ধরনের, আর এর সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য ছিদ্র। আর এর ভাজে ভাজে রঙ বেরঙের নানা রকম শামুক! সুগন্ধা ও লাবনী বিচে এই শামুকগুলো কত যে খুঁজেছি একটাও পাইনি। আর এখানে এইগুলো কুড়াতে কুড়াতে আমার আফগানী কোটির পকেটগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। এরপরও মনে হচ্ছে, ঐ পাথরের নিচে হয়তো আরও সুন্দর শামুক পাওয়া যাবে! সামনে সবচেয়ে উঁচু যে পাথরটা, সেখানে গিয়ে পালা করে অনেকেই দাঁড়াচ্ছে। এক পর্যায়ে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম। ঢেউগুলো খুব শক্তি নিয়ে এসে এই পাথরের গায়ে আছরে পড়ছে। আর এই আঘাতে পানি শরীরের অনেকাংশ ভিজিয়েও দিচ্ছে! কিন্তু সেদিকে কারও কোনো পরোয়া নেই! অনেকাংশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলাম। পুরো অস্তিত্ব জুড়ে যেন আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেলো। আমাদের দাপাদাপি দেখে হুয়ররা হয়তো মনে মনে হাসছেন! কয়েকবার ফিরে আসার জন্য ডাকাডাকি করে ব্যর্থ হয়ে হুয়ররা নিজেরাই গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলে আমরা আন্তে আন্তে সেখান থেকে ফিরে এলাম। আমাদের অবস্থা হয়েছে, এক কদম এগিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে যাই। এরকম আগুপিছু করতে করতে হাঁচড়ে পাচড়ে কোনো রকমে নিজেকে গাড়িতে তুললাম।

গাড়িটি ইউটার্ন নিলো। কী ব্যাপার! তাহলে কি হিমছড়ি যাওয়া হবে না! পরে জানতে পারলাম হিমছড়ি অতিক্রম করেই আমরা এখানে এসেছি। ভেবেছিলাম হিমছড়ি হয়তো এখান থেকে আরও সামনে। গাড়ির ইউটার্ন দেখে কপাল কঁচকে গেলেও পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। পথে দেখলাম সিএনজি ইত্যাদি থামিয়ে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা লোকদেরকে চেক করছে। আমাদের গাড়ির চালক বললেন, এই পথে মানুষ মিয়ানমার থেকে মাদকদ্রব্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাচার করে থাকে। তাই এদেরকে এখানে চেক করা হচ্ছে। যেতে যেতে সেই সুন্দর জায়গাগুলো আবারও দেখা হলো। গাড়ির বাইরে চোখ ঝলসে দেয়া রোদ! জানালায় আই প্রটেক্ট কালো গ্লাস থাকায় বাইরে তাকানো যাচ্ছে। বায়ে চোখ ছোট ছোট করে তাকালে দূরে সাগরে ভাসতে থাকা কিছু সাম্পান আরো ছোট হয়ে দৃষ্টিতে ধরা দেয়! সাগর আর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে আমরা হিমছড়ি এসে পৌঁছলাম।

পাহাড়ের নিচে বেশ কিছু জায়গা নিয়ে মানুষজন বিভিন্ন ধরনের দোকান সাজিয়ে বসেছে। পাহাড়ে উঠতে টিকেট কাটতে হয়! আমরা প্রয়োজনীয় কিছু সামান্য কিনে আল্লাহর নামে পাহাড়ে আরোহণ শুরু করলাম। কাফেলার সবার আগে ছিলাম আমি। পাহাড়ে উঠার অনেকটা পথ সিঁড়ির মত করে পাকা করে দেওয়া হয়েছে। দুই পাশে রেলিংও রয়েছে! তারপরও উপরে উঠতে উঠতে হাঁটু ভেঙ্গে আসছিলো। এদিকে সিঁড়িও আর নেই। উঠতে কিছুটা সহজ করার জন্য ইট ফেলে রাখা হয়েছে। কোনো দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা চূড়ায় গিয়ে চলার ক্ষান্ত দিলাম। একটা জায়গা খুঁজে সেখানে বসে হা করে কিছুক্ষণ দম নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি। হুয়ররা সবাই চলে এসেছেন। নিজের দুর্বলতা যাতে দেখে না ফেলেন এজন্য সেখান থেকে উঠে পড়লাম। উপরে ছনের ছাউনি দেওয়া একটা সুন্দর জায়গা দেখে হুয়র আমাদের বসতে বললেন। পানির একটা বোতল সবার হাত ঘুরে আসতে আসতে আমার পর্যন্ত এসে শেষ! ইতোমধ্যে মুদীর সাহেবের অনুরোধে নায়েম সাহেব হুয়র আমাদের কিছু নসীহত করলেন। হুয়র বললেন— এই যে আমরা এত কষ্ট করে পাহাড়ের এত উপরে চড়লাম, সেটা যেন নিছক দেখার জন্য না হয়; বরং এখানে যেন আমরা সৃষ্টির এই বিশালতায় স্রষ্টার বিশালত্বকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি...। একে তো এত উপরে উঠার ক্লান্তি, তার ওপর আবার এরকম ছায়ায় ঝিরিঝিরি বাতাস! ঘুমের কারণে চোখের পাতা খুলে রাখাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই হুয়রের কথায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছি না। পরে মুদীর সাহেব হুয়রও কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। যার সারাংশ মোটামোটি এরকম— এই দেখো! আমরা এখানে এসেছি নিছক পর্যটন করতে। এই পাহাড়ে উঠেছি বেশির থেকে

বেশি আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টি অবলোকন করতে! কিন্তু দেখো! সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এই বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। এই নিকট সময়েও আফগানিস্তানের ভায়েরা আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য পাহাড়ে, বোপঝাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে জিহাদ করেছে...। হুযূর আরও অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু ক্লান্তি ও ঘুমের কাছে পরাস্ত হয়ে তার অনেকটাই ছুটে গেলো। হায়!

হুযূর আমাদেরকে একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্য দশ মিনিট সময় দিলেন। আমরা যে যেদিকে পারি, মন ভরে দেখা শুরু করলাম। এক দিকে তাকালে সুবিশাল সাগরের অবিনশ্বর দিগন্তের শেষ প্রান্তে গিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে যায়, আর অপরদিকে তাকালে পাহাড়ের লাল সবুজের রঙ্গচ্ছটা হৃদয় মনকে রাস্তিয়ে তোলে! فتبارك الله أحسن الخالقين



প্রকৃতি দর্শন অনেক হলো। সাগরের নোনা পানি এখনো গায়ে মাখা হয়নি। গাড়ি আমাদেরকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিলো। আমরা তাড়াতাড়ি জামাকাপড় নিয়ে গোসলের উদ্দেশ্যে বিচ অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের ঝাঁঝালো রোদে সবকিছু অন্ধকার দেখছি। অবস্থা বেগতিক বুঝে অনেকটা বাধ্য হয়ে একশ টাকা খরচ করে একটা সান গ্লাস নিলাম। হুম! এখন অনেকটা সহনীয়। সুগন্ধা পয়েন্টে এসে জামাকাপড় নিয়ে পড়লাম বিপাকে। আমরা সবাই তো গোসল করতে নামবো। জামাকাপড় দেখবে কে? আর এগুলো রাখবোই বা কোথায়? অনেক ভেবে-চিন্তে ষাট টাকা দিয়ে এক ঘণ্টার জন্য একটা ডাবল বেডের সিট ভাড়া নিলাম। আমরা চারজন একসঙ্গে পানিতে নেমেছি। তাদের মধ্যে আমি একাই সাতার নামক দুর্লভ জিনিসটার মালিক নই। তাই প্রথমে একটু ভয় ভয় করলেও এক পর্যায়ে নিজেকে সামলে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। একটু পানি চোখের ভেতরে গেলেই ভীষণ জ্বালা করছে। পাড়ে না থেকে আন্তে আন্তে অনেকটা দূরে সরে এসে ঢেউয়ের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলায় না গিয়ে রক্ষণাত্মকভাবে তার সাথে বোঝাপড়া করছি। আমাদের খুব কাছ দিয়ে একটা সাম্পান ঘুরাঘুরি করছে। সম্ভবত ঝিনুক তুলছে।

প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি সমুদ্রে অবগাহন শেষে পাড়ে উঠে এলাম। দুইটার সময় হুযূর সবাইকে এক জায়গায় থাকতে বলেছেন বিধায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জামাকাপড় নিয়ে সোজা হোটলে চলে এলাম। নামায পড়ে হুযূরদের হোটেল সিলভার বে-তে গিয়ে হুযূরকে ফোন দিলে তিনি আমাদের সঙ্গে নিচে এসে মিলিত হলেন। সবাই মিলে দুপুরের খাবারের জন্য বের হলাম।

হুযূর আমাদেরকে যে হোটলে নিয়ে আসলেন, তার নাম ‘তাজ বে’। অভিজাত হোটেল বলেই মনে হলো। এখন ব্যস্ত সময়! তারপরও আমাদের সকলের এক সঙ্গে বসার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। আজকের দুপুরের আইটেম ছিলো, ধবধবে সাদা ধোঁয়া উঠা আতপ চালের ভাত, সাগরের কোরাল মাছ, পাঁচ থেকে সাত ধরনের ভর্তা/ভাজি ও আনলিমিটেড ডাল! ও হ্যাঁ, শুরুতে হালকা বোলসহ বরইয়ের চাটনিও ছিলো। শেষে মেহমানদারী হিসেবে ফিরনিটা ছিলো অপ্রত্যাশিত! কীভাবে? বলছি—

খাবারের শুরুতে বরাবরের মত এবারও মুদীর সাহেব হুযূর খাবার বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুযাকারা করেছিলেন। তো আমাদের খাবার যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখন খাবার পরিবেশক এসে হুযূরকে বললেন— হুযূর! আপনাদের বিল এক ভাই দিয়ে দিতে চাচ্ছেন! হুযূর বললেন— না! আমাদের বিল একজন অপরিচিত ব্যক্তি কেনো দিবেন? সেই ব্যক্তি হুযূরের কাছে এসে যা বললেন তার সারসংক্ষেপ হলো, খাবারের শুরুতে তিনি হুযূরের মুযাকারা শুনেছেন এবং হুযূরের আলোচনা তার কাছে ভালো লেগেছে। তাই তিনি খুশি হয়ে আজ দুপুরে আমাদের মেহমানদারী করাতে চান। আর মেহমানদারীর শেষে মিষ্টিমুখ করানো যেহেতু আদবের ভিতরে পড়ে, তাই আমাদের সামান্য মিষ্টিমুখ করানো আর কি!

মুদীর সাহেব হুযূর আমাদের যারা তাদের আপনজনদের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে চায়, তাদেরকে আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় দিলেন। বলে দিলেন, মাগরিবের আগে যেন অবশ্যই আমরা বিচে একত্রিত হই! ব্যস! সবাই যার যার মত কেনাকাটা করতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। রাস্তার পাশে খুব কায়দা করে সাজিয়ে রাখা শামুকের বিচিত্র মালাগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে! ঝুলে থাকা রঙ বেরঙয়ের বার্মিজ আচারের প্যাকেটগুলো যে কারো জিভে জল আনতে বাধ্য করবে। পকেটে যে কয়টা শিকা সে সময় পর্যন্ত টিকে ছিলো, তার সবটাই বের করে নেওয়ার জন্য দোকানদাররা যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসে আছে। আপনি নিবেন না? এরকম কোনো অপশন নেই! পরিবেশটা এমন করে রেখেছে যে আপনাকে নিতেই হবে! আর না হয়...।

আমি এমনতেই সাদেগী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মানুষ, তার উপর আবার এতো প্রিয় মানুষদের ফেরকা নেই, তাই অতি সংক্ষেপেই এই পর্বটা শেষ করে ফেললাম। আকবুর জন্য চেরী ফল, আম্মু এবং ভাবীর জন্য শামুকের কয়েকটা হাবিজাবি, ভাইয়ার জন্য কী যেন নিলাম! মনে নেই। আরো নিলাম বার্মিজ আঁচার। মুখোরোচক কিনা তা জানি না, তবে দৃষ্টিনন্দন! এতেই যেন আমার পকেট দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার যোগাড়! তাই এই অযাচিত পকেট ধরস থেকে বাঁচতে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বিচে চলে গেলাম।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। এখন আর দিগন্তের লাল আভা নেই। পাশের মসজিদ থেকে তাকবীরের আওয়াজ শুনে নামাযের জন্য রওয়ানা হলাম। নামায শেষে মনে হলো সাগরকে আরেকবার একটু কাছ থেকে দেখি। বিদায় তো নেওয়া হলো না। অন্তত শেষবারের মত বিদায় তো দিয়ে আসি! এদিকে হাতে সময়ও একেবারেই নেই। মাগরিবের নামায পড়েই আমাদের গাড়িতে উঠার কথা। অনেকক্ষণ দোটানায় ভুগে অবশেষে হোটেলের ফিরে আসলাম। দেখি আমি ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত! সবার মাঝেই কেমন একটা বিষাদ বিষাদ ভাব। ধারণা করলাম, সাগরের মায়া ছেড়ে যেতে বোধ হয় আমার মত তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একটু পর শুনে পেলাম ভিন্ন কথা। মুদীর সাহেব হুযূরের মোবাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না। বিচ থেকে আসার পথে হয়তো কেউ হাতিয়ে নিয়েছে! হুযূর এ মুহূর্তে থানায় আছেন। জিডি করতে গিয়েছেন। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো!

থানা থেকে হুযূর যখন ফিরলেন, ঘড়ির কাটা তখন আটটার ঘর পেরিয়ে গেছে। হুযূর এসেই আর বিলম্ব করলেন না। আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। ইশার নামায আদায় করেই গাড়িতে উঠে গেলাম। বিদায় কক্সবাজার! বিদায় আমার শৈশবের স্বপ্নস্থান! বিদায় আমার হারিয়ে ফেলা কিছু সুন্দর মুহূর্তের সুন্দরতম সঙ্গী! বিদায় সমুদ্র তটে আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউ! বিদায় আমার একটি স্বপ্নের মুছে যাওয়া বালুচর! বিদায় আমার হৃদয় ক্যানভাসে রঙ ছড়ানো রংতুলি! বিদায় আমার যাপিত সময়ের আবীর মাখা গোধূলী! বিদায় আমার হৃদয়াকাশে উড়ে চলা একটি সুন্দর ও শুভ্র বলাকা! বিদায় আমার শূন্য হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজ করতে থাকা একটি সবুজ ও সুন্দর অভয়ারণ্য! বিদায়!!

গাড়ি চলছে উদ্যম গতিতে! সফরের ক্লাস্তি এখন যেন সকলকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেউ তন্দ্রায়, কেউ নিদ্রায়। কিছুক্ষণ আগে মুদীর সাহেব হুযূর আমাদের সকলের কাছ থেকে এই সফরের অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সবাই কম বেশি বলেছে। শুরুটা হয়েছে সেই আমাকে দিয়েই। বললাম— এই সফরে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো জামিয়া রশীদিয়া, হাটহাজারী ও পটিয়ার মতো মাদরাসাগুলোর যিয়ারত ও সেখানকার বড়দের সোহবত! কারণ ভবিষ্যতে হয়তো এই কক্সবাজারে আবার আসা হবে, হিমছড়ি পাহাড় ও ইনানি বিচে আবার হয়তো যাওয়া হবে, কিন্তু এই মাদরাসাগুলোতে আসা হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই? কিংবা ভবিষ্যতে হয়তো সেই মাদরাসাগুলোতেও যাওয়া হবে, কিন্তু তখন মুফতী ইয়াহইয়া সাহেবদের মত বড় বড় আল্লাহওয়ালার সোহবত পাবো কিনা তা-ও জানি না? তার উপর মুফতে পাওয়া হুযূর থেকে তিন তিনটা আলী মরতবার সনদের মতো দুর্লভ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে জোটে...! এরকম কিছু বিক্ষিপ্ত কথায় আমার অনুভূতি প্রকাশ করে ক্ষান্ত

দিলাম। আমার পরে অনেকে তাদের অনুভূতির কথাই বলল। একই সাথে সফর করেছি। সবার কথা একই ধরনের হবে এটাই স্বাভাবিক। তার মধ্যেও সকলের কথাতেই নতুন নতুন কিছু দিক বেরিয়ে আসলো, যা শুনে আলহামদুলিল্লাহ ইস্তিফাদা হলো।

নীরব নিস্তন্ধ চারদিক! গাড়ির ভেতরে সবাই ব্যস্ত নাক ডাকায়! আমার পাশে বসা ভাইটি বারবার আমার কাঁধে পড়ে যাচ্ছে ঘুমের প্রচণ্ডতায়। একটু আগে রাস্তার পাশে একটা দোতলা হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া হলো। রাতের খাবার পর্ব শেষ করে গাড়িতে চড়লাম। দূর থেকে হেড লাইটের আলোগুলো ছুটে এসে একটু সময়ের জন্য গাড়ির ভেতরটা আলোকিত করে আবার চলে যায়। রাস্তার পাশের ফ্লাগ লাইটগুলো যেন পাল্লা দিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে ছুটে এসে আবার পিছনে হারিয়ে যাচ্ছে। লাইটের হলদে আলো রাতের কুয়াশার সঙ্গে মিশে অদ্ভুত এক মিশ্র অনুভূতি হৃদয়কে দোলা দিলো। এ অনুভূতি এক দিকে নিঃসঙ্গতার, অন্যদিকে অন্তরঙ্গতার। আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকা ভাইটা এখন কত দূরে! তাকে বললে হয়তো সে বিশ্বাসও করবে না! কিন্তু মাথার উপর জ্বলতে থাকা তারাগুলো কী নিবিড়ভাবে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে! তাই খুব কাছের জনপদকে মনে হলো খুব দূরের, আর দূর আকাশের জ্বলজ্বলে তারকাগুলোকে মনে হলো খুব কাছের। ভাবলাম, এভাবে সারা জীবন যদি নিকটকে মনে হতো দূরের আর দূরকে মনে হতো নিকটের, তাহলে জীবনটা হয়তো আমাদের অন্যরকম হতো, শিশির ধোয়া সুন্দর ও পবিত্র হতো, আত্মার সজীবতায় জীবন্ত হতো!

ফজরের সময় হয়ে গেলো। সোনারগাঁয়ের পিরোজপুরে একটা পাম্পে ফজরের নামাযের জন্য বিরতি দেওয়া হলো। গাড়ি থেকে নেমে দেখি দাঁড়াতে পারছি না। হাঁটু ভেঙ্গে আসছে! একটানা একইভাবে বসে ঘুমানোর অনিবার্য ফল! এটা ওটা ধরে কোনো রকমে নিজেই সামলে নিলাম। তবে আলহামদুলিল্লাহ! স্বাভাবিক হতে খুব বেশি লাগলো না। আমরা উয়ূ-ইস্তিঞ্জা সারছি, ইতোমধ্যে আরও একটা গাড়ি আসলে তারা সবাই আমাদের সঙ্গে একত্রে নামায আদায় করলো।

নামাযের পর কিসসা মুখতাসার! সকালের হালকা নাশতা হিসেবে সবাই এক প্যাকেট করে বিস্কুট পেলাম। ঢাকার রাস্তায় তখনও জ্যাম নামক উপদ্রপটা শুরু হয়নি! ঝিমুতে ঝিমুতে একবার চোখ খুলে দেখি চিটাগাং রোড। পরের বারে চলে গেলাম মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে! গাড়িতে তখন চলছিলো, ‘তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর, না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর! কত সুন্দর!’ লাগাতার প্রবল ঝাঁকুনিতে পরের বার যখন চেতনা ফিরে এলো, চোখ না খুলেই

বুঝলাম, গাড়ি চল্লিশ ফিটে প্রবেশ করেছে! মা'হাদের সামনে এসে যখন গাড়ি
থামলো তখন ঘড়ির কাটায় সকাল সাতটা বেজে ত্রিশ মিনিট।

নিকট অতীতে যেসব বরণ্য আলেমকে হারালাম

মৃত্যু একটি সুনিশ্চিত বিষয়। প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। মানুষের আগমন যেন চলে যাবার জন্যেই। পৃথিবীতে প্রতিদিন কতো মানুষ আসে। আবার তারা চলে যায়। হারিয়ে যায় ইতিহাসের অতল গহ্বরে। কে-ই বা তার খোঁজ রাখে। তবে কিছু মানুষ নিজেদের অমর কীর্তি রেখে যায়, যা তাদেরকে চির ভাস্বর করে রাখে। সদ্য বিদায় নেওয়া এমনই কিছু মহামনীষী আলেমদের বিবরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে। (বর্ণনার ক্রমধারা মৃত্যু তারিখ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে)

১. মাওলানা হাশমাতুল্লাহ রহ.

(মৃত্যু: ১৯ মার্চ ২০২১ ঈসাব্দী)

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরুর দিকে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ থানার, দক্ষিণ দিঘলদী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ রহ.-এর বড় জামাতা এবং মা'হাদের মজলিসে শুরুর অন্যতম রুকন মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব দা.বা.-এর পিতা। পড়াশোনা শেষ করার পর বড় কাটারা মাদরাসায় তাদরীসের খেদমত শুরু করেন। অতঃপর বড় কাটারা থেকে বিদায় নিয়ে মতলব দক্ষিণ মুন্সির হাটে রিয়াজুল উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামে মিতফতুল্ল উলূম নামে আরও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত যাবার কালে এক মুবারক পরিবার রেখে গেছেন। নিজ সন্তানদেরকে হাফেয-আলেম বানিয়ে তিনি পরকালের পথে রওয়ানা করেছেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে ১৩ জন কুরআনের হাফেয রয়েছেন।

২. মুফতী ওয়াক্কাস রহ.

(মৃত্যু: ৩১ মার্চ ২০২১ ঈসাব্দী)

১৯৫২ সনের ১৫ জানুয়ারি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সনে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইফতা সমাপন

করেন। তিনি যশোর মাদানী নগর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল-হাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়াহ এর কো-চেয়ারম্যান ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাবেক মহাসচিব ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ইসলামী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩. মাওলানা দলীলুদ্দীন রহ.

(মৃত্যু: ৬ জুলাই ২০২১ ঈসাব্দী)

নিভৃতচারী এক আল্লাহ প্রেমিক। মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার মুদীর, মুফতী মাহমুদুল আমীন দা.বা.-এর সম্মানিত পিতা। তিনি ছিলেন বাহাদুরপুর আলিয়া মাদরাসার দীর্ঘকালের ভাইস প্রিন্সিপাল। তিনি ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর জানাশোনা ছিলো বিশ্বকর রকমের। তিনি হাজী শরীয়াতুল্লাহ রহ.-এর পঞ্চম প্রজন্ম পীর মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া রহ.-এর কাছে মানুষ ছিলেন। দীনী আন্দোলনে ছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ সহকর্মী। দীন কেন্দ্রীক তাঁর এ ভূমিকাগুলো আজও এলাকার মানুষের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। তিনি বাহাদুরপুর পীর সাহেব রহ.-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তাঁর আগমনে বহুবার মা'হাদ ধন্য হয়েছে।

৪. আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী রহ.

(মৃত্যু: ১৯ আগস্ট ২০২১ ঈসাব্দী)

১৯৫৩ সনের ৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার প্রসিদ্ধ গ্রাম বাবুনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি করাচির জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ায় বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ.-এর কাছে দুই বছর উলূমুল হাদীস পড়েন। দেশে আসার পর আজিজুল উলূম বাবুনগর মাদরাসায় দীর্ঘদিন তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম দেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাবুনগর মাদরাসায় তিনি 'উলূমুল হাদীস' বিভাগ চালু করেন। পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় চলে আসেন এবং শাইখুল হাদীস ও শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মাওলানা আহমাদ শফী রহ.-এর ইত্তিকালের পর তিনি হেফাজতে ইসলাম-এর আমীর নিযুক্ত হন।

৫. মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী রহ.

(মৃত্যু: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈসাব্দী)

জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরী টাউনের মতো ঐতিহ্যবাহী, কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বহু বছর যাবৎ দারুল ইফতার যিম্মাদার ছিলেন। মুফতী ওলী হাসান টোফী রহ.-এর ইন্তেকালের পর তিনিই দারুল ইফতার প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামের মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় হাদীস ও ফিকহের খেদমতে যুক্ত হন। এখানে তাকে ‘মুফতীয়ে আযম’ হিসেবে বরণ করা হয়।

৬. আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারী রহ.

(মৃত্যু: ২১ জুন ২০২২ ঈসাবী)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দীনী প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরিচালক, আল-হাইআতুল উলয়া কওমী শিক্ষাবোর্ডের স্থায়ী কমিটির সদস্য, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের মহাসচিব। তিনি বহুমুখী খিদমাত একাই আঞ্জাম দিয়েছেন। একাধারে জামিয়া পটিয়ার প্রধান, জামিয়ার শাইখুল হাদীস, মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান সম্পাদক। এতদসত্ত্বেও তাঁর আমলের পাবন্দী ছিলো নজরে পড়ার মত।

৭. ডক্টর ইউসুফ কারযাবী রহ.

(মৃত্যু: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঈসাবী)

মুসলিম বিশ্বের একজন বিখ্যাত আলেম। মিশরের মুসলিম স্কলার ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স এর সাবেক প্রেসিডেন্ট। বিশিষ্ট দার্শনিক, লেখক ও গবেষক।

৮. মুফতী রফী উসমানী রহ.

(মৃত্যু: ১৮ নভেম্বর ২০২২ ঈসাবী)

মুফতী শফী রহ.-এর বড় সন্তান। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দা. বা.-এর বড় ভাই। ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর ইন্তিকালের পর থেকে তিনিই জামিয়া দারুল উলুম করাচীর ‘সদর’ ছিলেন। তাঁর উস্তাদ মুফতী ওলী হাসান টোফী রহ.-এর পর উলামায়ে কেরাম তঁকে ‘মুফতীয়ে আযম’ (পাকিস্তান) খেতাবে স্মরণ করতেন।

৯. মুফতী শহীদুল ইসলাম রহ.

(মৃত্যু: ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ ঈসাবী)

আল-মারকাযুল ইসলামী (এএমআই) বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য। ১৯৮৮ সনে তিনি ‘আল-মারকাযুল ইসলামী’ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে নিঃস্বার্থ জনকল্যাণমূলক কাজে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। করোনা মহামারির সময় তাঁর এ প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনসাধারণের দাফন-কাফনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

১০. মাওলানা মুমতাজুল করীম ‘বাবা হুযূর’ রহ.

(মৃত্যু: ২৭ মার্চ ২০২৩ ঈসাবী)

চট্টগ্রামস্থ ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ‘বাবা হুযূর’ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তালেবে ইলমদের প্রতি গভীর পিতৃসুলভ স্নেহ লালন করতেন। হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ.-সহ পাক-বাংলার বহু আকাবির উলামার সান্নিধ্যধন্য ছিলেন। ইলমী অঙ্গনে মেহনত করার পাশাপাশি তিনি দীনদার আহলে খায়ের শ্রেণীকে দীনী মাদরাসাগুলোর প্রতি মনোযোগী করতেন। এসব কাজ তাঁর যিন্দেগীর মিশনের মতো ছিলো।

১১. মাওলানা শিবির আহমাদ রহ.

(মৃত্যু: ২৯ মার্চ ২০২৩ ঈসাবী)

নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম চরমটুয়া মাদরাসার সদরুল মুদাররিস ছিলেন। বাংলাদেশে আরবী ব্যাকরণ (নাছ-সরফ) নিয়ে গবেষণা এবং পাঠদানের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ আলেম। মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানেও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১২. আল্লামা ইয়াহইয়া রহ.

(মৃত্যু: ২ জুন ২০২৩ ঈসাবী)

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী রহ. ইন্তেকালের পর তিনি হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর। তিনি মুফতীয়ে আযম ফয়যুল্লাহ রহ.-এর মত যুগশ্রেষ্ঠ আকাবির উলামায়ে কেরামের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন।

চট্টগ্রামে মা'হদের এক ইলমী সফরে তিনি মা'হদের আসাতিয়া ও তলাবাদেরকে খুব মহব্বতের সাথে সাক্ষাত দেন এবং হাদিসে সনদ প্রদান করে ধন্য করেন।

১৩. হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান রহ.

(মৃত্যু: ২ নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী)

স্বীয় যামানার বড় বে-নযীর ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা বুয়ুর্গানে দীন এবং উলামায়ে কেরামের সোহবত যে কেমন প্রভাবক, তার যিন্দা নমুনা ছিলেন তিনি। উপমহাদেশের বিখ্যাত দুই বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফিজ্জী এবং মুহিউসসুল্লাহ মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর দীর্ঘ সোহবতে ধন্য হন এবং খেলাফত লাভ করেন। তিনি কুরআনের অত্যন্ত আশেক ছিলেন। তাই তাঁর সারা জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা ছিলো কুরআনের খেদমত করা। তিনি সাদামাঠা জীবন-যাপন করতেন এবং বলতেন তাঁকে যেন সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৪. মাওলানা আব্দুর রউফ রহ.

(মৃত্যু: ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী)

১৯৩৬ সনের ৩ মার্চ উপজেলার বাহেরকুচি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপনের পর হযরত মাওলানা শাসছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব) রহ.-এর পরামর্শে তিনি পাকিস্তানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানুদ্রী রহ.-এর কাছে উলুমুল হাদীস পড়েন। দেশে আসার পর ছদর সাহেব হুযূর তাঁকে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেন। তখন থেকেই তিনি গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি দেশের পঞ্চাশটিরও বেশি মাদরাসায় সহীহ বুখারীর দরস দিয়েছেন।

এছাড়াও দেশ-বিদেশে আরো অনেক উলামায়ে কেরাম ইত্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদেরকে তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী ও সদকায়ে জারিয়া হিসেবে করুল করুন।

ফা তা ও যা মা সা ই ল

ফাতওয়া বিভাগ : মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

হাফেয মাওলানা কাউসার আহমাদ

উথলী, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মৃত আত্মীয় স্বজনদের ইসালে সাওয়াবের নিয়তে বৎসরে একবার দু'আ অনুষ্ঠান এবং আগত মেহমানদের জন্য খাবারের আয়োজন করে থাকে। একই দিনে বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জা গান-বাদ্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এরূপ অনুষ্ঠানে দু'আ ও খাবারের আয়োজনে অংশগ্রহণ করার বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তে মৃত্যু-বার্ষিকী পালনের কোন ভিত্তি নেই। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেরঈন ও তাবে তাবেরঈদের যুগে এর প্রচলন ছিলো না। সুতরাং মৃত্যু-বার্ষিকীর রীতি পালন নিছক মনগড়া ও বিজাতীয় একটি কুসংস্কার। তাই এ উপলক্ষে মিসকীন খাওয়ানো বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক নয়! বরং শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।

তবে মৃতদের রুহের মাগফিরাতের জন্য উত্তম হলো, কোনো দিন-তারিখের দিকে লক্ষ না রেখে গোপনীয়তা রক্ষা করে বৎসরের যে কোনো সময় অবস্থা, সুযোগ ও সামর্থ অনুযায়ী ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীব, ইয়াতীমদেরকে আহাির করানো বা লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে গরীব ছাত্রদের জন্য দান, সদকা করা। এতে সাওয়াবও অনেক বেশি হয়, সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবও পাওয়া যায়। তদ্রূপ নফল ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমেও সাওয়াব রেসানী করা যায়।

কিন্তু প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু আলোকসজ্জা, পর্দাহীনতা ইত্যাদির মাধ্যমে গান-বাদ্য ও অন্যান্য গোনাহের কাজ হয়ে থাকে, তাই ইসালে সাওয়াবের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন ধরনের গোনাহের আয়োজন হয় বিধায় এ ধরনের অনুষ্ঠানে দু'আ ও খাবারের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

বিশেষত উলামায়ে কেরাম ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এ ধরনের আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরী। সাধ্যানুযায়ী এ ধরনের গোনাহের প্রচলন সমাজ থেকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টায় সোচ্চার হওয়া জরুরী।

—সূরা মায়িদা; আয়াত ২, সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৩৭, ২০৪২, শরহুল ফিকহিল আকবার; পৃষ্ঠা ১৮৫, হাশিয়াতুত তাহতবী; পৃষ্ঠা ৬১৭, আল-হিদায়া ৪/৪৫৫, ফাতহুল কাদীর ১০/১৫, রদুল মুহতার ৩/১৪৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৩৩৭, ইমদাদুল আহকাম ১/২০৩, ২০৪, ইমদাদুল আহকাম ১/১৯২, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/১৯৬।

মুফতী ফয়জুল্লাহ

নাখাল পাড়া, ঢাকা

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে হাজীক্যাম্পে পৌঁছে ইহরাম বাঁধার পর স্বামী মারা যান। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত মহিলা ইদত পালন করবে, নাকি তার ছেলে বা অন্য কোনো মাহরামের সাথে হজ্ব আদায় করতে পারবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য ইদত পালন করা আবশ্যিক। ইদত অবস্থায় হজ্ব যাওয়া জায়েয নয়। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর রাযি. ও উসমান রাযি.-সহ অনেক সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে যে, তারা এমন অনেক মহিলাকে হজ্ব ও উমরা থেকে বারণ করেছেন, যারা ইদত পালন করা অবস্থায় হজ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তবে যেহেতু উক্ত মহিলা ইহরাম বাঁধার পর ইদতের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তাই একটি দম বা তার মূল্য হেরেম শরীফে পাঠিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। অতঃপর যখন উক্ত দমটি জবাই হয়ে যাবে তখন উক্ত মহিলা হালাল হয়ে যাবে।

—মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ১৯১৭৮, ১৯১৭৯, ১৯১৮০, আদুররুফল মুখতার ২/৪৬৫, ৫৯০, রদুল মুহতার ২/৪৬৫, ৫৯০, বাদায়িউস সানায়ে ২/৩০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮২, ২৮৩, গুনইয়াতুন নাসিক; পৃষ্ঠা ৩৫, আল-ফিকহুল হানাফী ১/৪৫৪, ফাতহুল কাদীর ৩/১১২, বাদায়িউস সানায়ে ২/৩৯০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩১৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/৬২, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/১৭৩।

এইচ.এম. সাইদুল ইসলাম

হীরাখিল আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম রোড, নারায়ণগঞ্জ

প্রশ্ন : টিকেট কেটে মাছ ধরার বিষয় জানতে চাই। ধরুন, মাছ ধরার ঘাটসহ এক ছিপের টিকেটের দাম ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। সারাদিন যে যত মাছ ধরতে পারে। অনেক সময় আবার যে বেশি মাছ ধরতে পারে সে পুরস্কারও পায়। কিন্তু সেটা খুব কম। অনেক সময় যে টিকেট দেয় সেটা তার লিজ নেওয়া

অথবা সরকারি জায়গা দখল করে সে তার টাকায় মাছ ছেড়ে একটা সময় পর টিকেট দেয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে টিকেট কেটে মাছ ধরার বিধান কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ১০০০/- (এক হাজার) টাকার টিকেটের মাধ্যমে বড়শি যোগে নির্দিষ্ট সময়ে মৎস শিকার করার দু'টি শরয়ী বিশ্লেষণ হতে পারে—

(এক) মৎস শিকারী ১০০০/- (এক হাজার) টাকা দিয়ে একটি মাছের পুকুর ভাড়া নিয়েছে। সাথে পুকুর মালিক থেকে একটি ছিপ ফ্রি পেয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সে পুকুর থেকে মাছ ধরে আহার করবে। সুতরাং এ পছাটি শরয়ী পরিভাষায় اجاره বা ভাড়ার চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে শরয়ী মূলনীতি হলো, যে বস্তু ভোগ করা হলে তার عين অর্থাৎ স্বয়ং বস্তুটিই নিঃশেষ হয়ে যায়, তা ভাড়া হিসেবে প্রদান করা ও গ্রহণ করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যে বস্তু ভোগ করা হলে তার عين অর্থাৎ স্বয়ং বস্তুটি নিঃশেষ হয় না বরং তা অক্ষত রেখে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় তা ভাড়ার চুক্তিতে প্রদান করা ও গ্রহণ করা উভয় জায়েয আছে। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে টিকেট কেটে মাছ ধরার ক্ষেত্রে যেহেতু معقود তথা ভাড়ার বস্তু মাছ ভোগের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যায় তাই মাছকে معقود তথা ভাড়ার বস্তু গণ্য করা জায়েয হবে না।

(দুই) মৎস শিকারী ১০০০/- (এক হাজার) টাকা দিয়ে একটি বড়শি এবং পুকুরের অজ্ঞাত ও কল্পিত কিছু মাছ ক্রয় করেছে। মৎস শিকারী ক্রেতা হিসেবে নগদ টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। কিন্তু টিকেট ইস্যুকারী বা পুকুর মালিক বিক্রেতা হিসেবে শুধু বড়শিটি ক্রেতাকে হ্যান্ডওভার করেছে। কিন্তু মৎস হ্যান্ডওভার করেনি। বরং পুকুর থেকে মাছ ধরে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে তাকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারণ সে সারা দিনে মাছ পেতেও পারে বা নাও পেতে পারে। আবার এক হাজার টাকার চেয়ে বেশি মূল্যের মাছও সে পেতে পারে। আবার সামান্য টাকার মাছও পেতে পারে। তো দেখা যাচ্ছে এ পদ্ধতিটি শরীয়া গৃহীত ক্রয় বিক্রয়ের কোন পদ্ধতির মাঝেই পড়ে না। কারণ টিকেট ভিত্তিক মৎস শিকারের উপরোক্ত পদ্ধতিটিতে জাহালত (অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা) গারার (ধোঁকা ও প্রতারণা) এবং কিমার (জুয়া) বিদ্যমান রয়েছে। আর এগুলোর যে কোনো একটির উপস্থিতিতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি অশুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং শরীয়ত গৃহীত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির দৃষ্টিতে দেখলে টিকেট ভিত্তিক মৎস শিকার পদ্ধতিটি কোনোভাবেই জায়েয নয়। অতএব উপরোক্ত পদ্ধতিতে না গিয়ে স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করাই কর্তব্য। অর্থাৎ ভাড়া করা জেলেদের দিয়ে মাছ ধরিয়ে সেই মাছ আলাদাভাবে বিক্রি করা।

উল্লেখ্য, সরকারি জমি দখল করে মাছ চাষ করা রাষ্ট্রীয় আইনে মারাত্মক পর্যায়ে অপরাধ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও ভয়াবহ রকমের গোনাহ। সুতরাং সরকারি জমিতে মাছ চাষ করে টিকেটের মাধ্যমে মৎস শিকারের আয়োজন করা দ্বিগুণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

—রদুল মুহতার ৬/৬৩, ফাতাওয়া কাযীখান ২/২১১, আল-মুহীতুল বুরহানী ৭/৪৮৮, শরহুল মাজল্লা ২/৫৪০, ৬৯৭, আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়াতুল মুকারানা ‘আত-তাজরীদ’ ৭/৩৩৩৩, কিতাবুল আসল ১১/৮৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭৪, তুহফাতুল উলামা ২/১২৮।

ডা. মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন : আমি ইউনানী চিকিৎসক হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রজেক্টে (অস্থায়ী) চাকুরি করি। চিকিৎসা সেবা প্রদান করার কারণে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর সাথে সাক্ষাত হয় এবং এ ধরনের মার্কেটিং স্টাফরা তাদের কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের পলিসি ব্যবহার করে থাকেন। কেউ প্রতিদিন ঔষধ স্যাম্পল দেন। কেউ খাতা, প্যাড বা কলম দেন। কেউ দামী দামী বিভিন্ন গিফট প্রদান করেন। কেউ মাসিক ও বাৎসরিক নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করেন। এমনকি সরাসরি টাকা না দিয়ে বাজার করে (রেশন) দেন।

বর্তমানে আমার কর্মস্থলে এরকম বিভিন্ন মার্কেটিং কর্মচারীদের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে তাদেরকে না করলেও কষ্ট পায় এবং বলে— স্যার! চাকুরির নিয়ম (পলিসি); আপনি গ্রহণ করে আমাকে উদ্ধার করেন।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে— (ক) এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের মত ডাক্তারদের করণীয় কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

(খ) হাসপাতালের সামনে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা থাকে, যারা রোগীকে নির্দিষ্ট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের লোককে পারিশ্রমিকের অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া বা তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে কি?

উল্লেখ্য, রোগীর আর্থিক ও মানসিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হবে বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না; ইনশা-আল্লাহ।

উত্তর : (ক) কোনো রোগী যখন নির্ধারিত চিকিৎসা ফি প্রদান করে ডাক্তারের কাছে আসে তখন ডাক্তারের দায়িত্ব হয়ে যায় রোগীকে সঠিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা। এক্ষেত্রে কোন্ কোম্পানীর ঔষধের নাম ডাক্তার লিখবেন এটি সম্পূর্ণরূপে

তার এখতিয়ারাধীন। যে ঔষধ ডাক্তারের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ কার্যকারী মনে হবে সেটির নাম লেখাই তার নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানে ঔষধ কোম্পানীগুলো অসাধু উপায়ে মার্কেট তৈরি করতে ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের দামী গিফট প্রদান করে তাদেরকে ঐ কোম্পানীর ঔষধের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। অথচ ডাক্তারদের তা কিসের বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু বলা হচ্ছে না। কারণ ব্যাপারটি তো সকলেরই জানা। অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্রে আমাদের ঔষধের নাম লিখবেন। অবস্থাদৃষ্টে একথা একেবারে স্পষ্ট যে, এ ধরনের গিফট ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। অবশ্য ঔষধের স্যাম্পল কিংবা বিজ্ঞাপন সম্বলিত চিকিৎসা সামগ্রী যেমন প্যাড, কলম, পেপারওয়াইট ইত্যাদি নেওয়া ডাক্তারের জন্য জায়েয আছে।

অতএব প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য কর্তব্য হলো, যে সকল সামগ্রী বা গিফট গ্রহণ করা বৈধ নয় সেগুলো গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং মার্কেটিং কর্মচারীদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলা যে, ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ, তাই আমি তা গ্রহণে অপারগ।

(খ) হ্যাঁ, শেষে যে শর্ত উল্লেখ করেছেন সে শর্ত সাপেক্ষে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ ধরনের লোক নিয়োগ করা বা তাদের সার্ভিস নেওয়া যাবে।

—সূরা নিসা; আয়াত ২৯, তাফসীরে কুরতুবী ৩/৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৬৫৩২, সহীহ বুখারী; হাদীস ৭১৪৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৩৯, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৭০৭, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের; পৃষ্ঠা ২২৯, বাদায়িউস সানায়ে ৩/৪৩০, আল-বাহরুর রায়িক ৪/৩১১, আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুওয়াইতিয়াহ ২২/২২১, ২২২, আল-বাহরুর রায়িক ৩/১২০, রদুল মুহতার ৬/৪৭, ৬৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১১৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১৩৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/৪০৮, মালে হারাম; পৃষ্ঠা ৯৭, ৯৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৬০, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৫/২৮৬।

মুনির হোসেন

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

প্রশ্ন : (ক) নিজের মালিকানাধীন অর্থায়নে কোনো হালাল ব্যবসার জন্য লাইসেন্স নিজ নামে না করে স্ত্রীর নামে অথবা বিশ্বস্ত কোনো আত্মীয়ের নামে করে মূলত নিজে পরিচালনা করলে উপার্জিত অর্থ শরীয়তের আলোকে হালাল হবে কিনা?

(খ) যদি হালাল হয় তবে লাভের টাকা থেকে যার নামে লাইসেন্স করা হয়েছে তাকে কোনো লভ্যাংশ দিতে হবে কিনা?

উত্তর : (ক) বর্তমানে ব্যবসার জন্য লাইসেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান একটি বিষয়। তাই অন্যের নামে লাইসেন্স করে নিজে তা পরিচালনা করতে চাইলে যার নামে লাইসেন্স করা হবে তার পক্ষ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। আর অন্যের নামে লাইসেন্স করে নিজে তা পরিচালনা করার দ্বারা কোনো ধরনের ধোঁকা, প্রতারণা বা রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করা যাবে না; বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে এর অনুমোদন থাকতে হবে।

সুতরাং প্রশ্লোক্ত ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে অন্যের নামে লাইসেন্স করে নিজে তা পরিচালনা করার দ্বারা শরীয়ী কোনো সমস্যা হবে না। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত শর্তাবলী লঙ্ঘন করে অন্যের নামে লাইসেন্স করে শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যবসা করা হয় তাহলে যদিও উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কিন্তু শরীয়তসম্মত শর্ত লঙ্ঘনের কারণে গোনাহ হবে।

(খ) যার নামে লাইসেন্স করা হবে তাকে লভ্যাংশ দেওয়া আবশ্যিক নয়। তবে তার সাথে কোনো চুক্তি হলে সেই চুক্তি মান্য করা জরুরী।

—সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, সহীহ বুখারী; হাদীস ২৯৫৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৪৫, আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুওয়াইতিয়াহ ২৮/৩২৩, শরহুল মাজাল্লাহ ২/৬১, ফিকহুল বুয়ু' ১/২৭৮, ২৮১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/৩৪১, কামুসুল ফিকহ ৩/২৭২।

জনাব আব্দুস সাত্তার

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ইন্ডিয়া যায়। সেখানে যাওয়ার পর ইন্ডিয়ান এক নারীর ডিম্বাণু নিয়ে তার শুক্রাণুর সাথে মিশ্রণ করে তার স্ত্রীর জরায়ুতে টেস্ট-টিউবের মাধ্যমে পৌঁছায়। যার ফলে তাদের একটি সন্তান হয়। কয়েক বছর পর উক্ত সন্তানের মা-বাবা উভয়ে মারা যায়। এখন জানার বিষয় হল উক্ত সন্তানটি কি তাদের সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে? এবং তাদের থেকে কি মীরাস পাবে?

উত্তর : পিতা-মাতার জন্য ঐ সন্তানই নিয়ামত যে সন্তান শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে শরীয়ী পদ্ধতি লঙ্ঘনের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানকে নেয়ামত বলা যায় না। এজন্য একটি মুসলিম দম্পতির জন্য আবশ্যিক হলো শরীয়ত বিরোধী কোন প্রক্রিয়ায় সন্তান গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা। টেস্ট-

টিউবের মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত কোনো পন্থা নয়। এজন্য সর্বাবস্থায় টেস্ট-টিউব পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তবে যদি একান্ত অপারগ হয়ে যায় এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সিদ্ধান্তে সম্ভাব্য সকল চিকিৎসা অকার্যকর হয় আর টেস্ট-টিউব ব্যতীত সন্তান গ্রহণের অন্য কোনো পদ্ধতি না থাকে, তাহলে শরীয়ত অনুমোদিত নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে টেস্ট-টিউব ব্যবস্থা গ্রহণ করার অবকাশ থাকবে। সেক্ষেত্রে শুধু স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নেওয়া হবে এবং স্ত্রীর দেহেই তা প্রয়োগ বা স্থাপন করা হবে। এ নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি না জায়েয। কারণ স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত তৃতীয় কোন পুরুষ বা মহিলার শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গ্রহণ বংশের ক্ষেত্রে মিশ্রণ ঘটায়, যা শরীয়তে অত্যন্ত গর্হিত বিষয়।

সুতরাং প্রশ্লোক্ত ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে সেটি একেবারেই নাজায়েয পদ্ধতি। তথাপি শরীয়তের বংশ সাব্যস্ত করণের নীতি অনুসারে উক্ত সন্তানটির বংশ ও মীরাসের সম্পর্ক গর্ভে ধারণকারিণী মহিলার সাথে এবং তার স্বামীর সাথে হবে। তাই উক্ত সন্তানটি তাদের সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং তার পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হিসেবে তাদের থেকে মীরাস পাবে।

—সূরা মুজাদালাহ; আয়াত ২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৪৫৭, ১৪৫৮ মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৩৯৬৮, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১১৩১, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১৪২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৬৬, বাদায়িউস সানায়ে ৫/৩৬৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৭/৩৫১, জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ৫/১৫৩।

□□□এই পাতাটি আপনার □□□

পাঠক এ পাতাটি আপনার জিজ্ঞাসা-জবাবের জন্য বরাদ্দ। এখানে আপনার জীবনঘটিত নানা সমস্যার ইসলামী সমাধান দেওয়া হয়। আপনার নানাবিধ ইসলামী অনুসন্ধিৎসা পূরণে আমরা সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

তাই যেকোনো বিষয়ে ইসলামী সমাধানের জন্য ই-মেইল করুন, কল করুন কিংবা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন আপনার জিজ্ঞাসাপত্রটি।

উল্লেখ্য, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমেও মা'হাদ ফাতাওয়া-মাসাইল প্রদান করে থাকে।

আমাদের ওয়েবসাইট : www.mahadbd.com

ই-মেইল : mbuhus@gmail.com

মোবাইল : ০১৮১১২২৮৯৯২, ০১৯৪০৩৭৬৭৪০, ০১৮৬৪৬২৩৫৮০

মা'হাদ প্রাঙ্গনে উলামায়ে কেরামের শুভাগমন

মা'হাদের নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি, বিভিন্ন মজলিস উপলক্ষে প্রায়ই শুভাগমন ঘটে দেশ বরেণ্য উলামা হযরত ও পীর মাশায়েখের। যাদের পদচারণায় ধন্য হয় মা'হাদ। আত্মিকভাবে উৎকর্ষিত হয় উলামা-তলাবা ও আপামর জনসাধারণ। ১৪৪২-৪৩, ১৪৪৩-৪৪ ও ১৪৪৪-৪৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষগুলোতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নিম্নে মজলিসগুলোর খণ্ডচিত্রণ তুলে ধরা হলো।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া মিলনায়তনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জামি'আতু উলুমিল ইসলামিয়ার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব দা.বা., নায়েবে মুহতামিম মুফতী আব্দুল গফফার সাহেব দা.বা. এবং উক্ত মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা তাহমীদুল মাওলা সাহেব দা.বা.।

কলমারচর শাখার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল

২৪ জানুয়ারি ২০২২ ঈসায়ী, সোমবার মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার কলমারচর শাখার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করেন আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব দা.বা.। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলান শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা.। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা.। সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ কলমারচর গ্রামখানি আলোকময় এ দীনী আয়োজনে বেশ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় উলামা মাশায়েখের আগমনে কলমারচর গ্রামটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আল্লাহ তা'আলা মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া কলমারচরকে অনেক বড় দীনের মারকায হিসেবে কবুল করে নিন।

মা'হাদের সবক উদ্বোধনী জলসা

১৬ মে ২০২২ ঈসায়ী, সোমবার অনুষ্ঠিত হয় মা'হাদের ১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের আনুষ্ঠানিক সবক উদ্বোধনী জলসা। বরকত পরশিত এ জলসায় আগমন করেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দামাত বারাকাতুহুম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখে সানী হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (মানিকগঞ্জী হুযূর) দামাত বারাকাতুহুম, মা'হাদের প্রধান মুফতী এবং জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আরো উপস্থিত ছিলেন মা'হাদের অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম ও পরিচালনা কমিটির দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মা'হাদ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম

সুস্বাস্থ্য আল্লাহর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত। কুরআন সুন্নাহে এ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তদানুযায়ী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠা প্রতিটি মানুষের দীনী দায়িত্বও বটে। স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করা ও যত্ন নেওয়াও একটি ইবাদত। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহেলা করা বা উদাসীন হওয়া মোটেও কাম্য নয়। মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করে। তাই মা'হাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম।

সে ধারাবাহিকতায় ২১ জুন ২০২২, মঙ্গলবার ছিলো মা'হাদের ১৪৪৩-৪৪ হি. মোতাবেক ২০২২-২৩ ঈ. শিক্ষাবর্ষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম। মা'হাদের সূচনা লগ্ন থেকে যিনি মা'হাদের সাথে নানাভাবে ছায়ার মতো লেগে আছেন সে মহান মা'হাদপ্রাণ ব্যক্তি মুহতারাম আনিসুর রহমান সাহেবের সযত্ন তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম। স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয় ছিলো চক্ষু পরীক্ষা। মা'হাদ মিলনায়তনকে চক্ষু চিকিৎসা সেবার উপযোগী করে তোলা হয়।

হালকা আপ্যায়ন শেষে সংক্ষিপ্ত দু'আর মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার মূল কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ছাত্ররা টিকেট সিস্টেমের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। চক্ষু পরীক্ষা কার্যক্রমের আয়োজক হিসেবে ছিলো সুবাতাস ট্রাস্ট, ভিশন কেয়ার ফাউন্ডেশন এবং বসুন্ধরা আই হসপিটাল গ্র্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। একশ জন ছাত্র-শিক্ষক এ চক্ষু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। জনাব আনিসুর রহমান সাহেবের সঞ্চালনায় চারজন চক্ষু চিকিৎসক নিরলসভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর অবধি স্বাস্থ্য পরীক্ষার এ কার্যক্রম চলতে থাকে। শিক্ষার্থীগণ চক্ষুসেবা পেয়ে বেশ পুলকিতা অনুভব করে। চিকিৎসকগণও চক্ষুসেবা প্রদান কালে ম'হাদের যাবতীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। দুপুরের আহার শেষে চিকিৎসক অতিথিদেরকে ম'হাদ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কিছু বই উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। মেহমানগণ এক রাশ ভালোবাসা ও ভালোলাগা নিয়ে ম'হাদ অঙ্গন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁদের ও ম'হাদের সকল দীনী কার্যক্রমকে কবুল করুন।

আওলাদে রাসূল মুফতী সালমান মানসূরপুরী দা.বা.-এর শুভাগমন

১৮ অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী তারিখে আওলাদে রাসূল ও দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মুফতী সালমান মানসূরপুরী সাহেব দা.বা. ম'হাদের নিজস্ব ভবনে আগমন করেন এবং ত্বলাবায়েরে কেরাম, উলামালে কেরাম ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহা পেশ করেন। তখনো ম'হাদের নিজস্ব ভবনে দরস-তাদরীসের কার্যক্রম শুরু হয়নি। সাময়িকভাবে পরিপাটি করে মসলিসের আয়োজন করা হয়। আশ-পাশের এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ ও ত্বলাবা-উলামায়ে কেরামের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ করা যায়। হযরত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত ও ম'হাদের নিজস্ব ভবনের জন্য দু'আ করে আমাদেরকে ধন্য করেন।

ম'হাদের নিজস্ব ভবনে প্রথম সবক উদ্বোধনী জলসা

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ম'হাদের নিজস্ব ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সবক উদ্বোধনী জলসা। বরকত পরশিত এ জলসায় আগমন করেন আল্লামা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দামাত বারাকাতুহুম, ম'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার প্রধান মুফতী হযরতুল আল্লাম মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুফতী আহমাদুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আরো উপস্থিত ছিলেন ম'হাদের অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম ও পরিচালনা কমিটির দায়িত্বশীলবৃন্দ।

ম'হাদের নিজস্ব কমপ্লেক্সে নিয়মিত সালাত ও দরস উদ্বোধন

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩, শনিবার ম'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার নির্মাণাধীন নিজস্ব ভবন আল-মদিনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে (রোড-৮, ব্লক-এফ, বহিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর ঢাকা -১২০৭ এ) উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সদস্য ও সুভানুধ্যায়ীদের যোহর নামায আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিত নামায শুরু হয়। এর পরদিন বাদ ফজর তরজমাতুল কুরআন দরসের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম নামাযে ইমামতি করেন হযরত মুফতি ইবরাহীম হাসান সাহেব দামাত

বারাকাতুহুম। যে সকল দীনপ্রাণ মানুষ দু'আ, বুদ্ধি, পরামর্শ, অর্থ ও শ্রম দিয়ে ম'হাদকে এগিয়ে নেওয়ার পথে সহযোগী হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব রহ.-এর জীবন ও কর্ম বিষয়ক আলোচনা মাহফিল

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, রোজ রবিবার বাদ মাগরিব হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব রহ.-এর জীবন ও কর্ম বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে আলোচনা পেশ করেন, মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা., মুফতী রিয়ওয়ানুর রহমান সাহেব দা.বা. এবং মুফতী হাবীবুর রহমান খান সাহেব দা.বা.। আলহামদু লিল্লাহ মাহফিলে দূরদুরান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক উলামা, ত্বলাবা ও সাধারণ লোকজনের সমাগম ঘটে। আলমদীনা জামে মসজিদটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে। আলোচকবৃন্দও প্রফেসর হযরতের জীবনের আলোকোজ্জ্বল দিক নিয়ে পবিত্র আবেগ মিশ্রিত সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন।

ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে ম'হাদের দেয়ালিকা প্রকাশ

প্রতিটি ভাষা আল্লাহ তা'আলার মহান এক নিদর্শন। প্রতিটি ভাষার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভাষার বৈচিত্র্যে মানবজাতির মাঝে ভিন্ন এক আবেগ ও সুখানুভূতি তৈরি হয়। ফলে ভাষা হয়ে ওঠে মানবজাতির আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভাব-বিনিময়ের পরম বন্ধু। বিপরীতে ভাষা কারো জন্য হয়ে উঠে শোষণের হাতিয়ার। জাতির উত্থান-পতনে ভাষা চরম প্রভাবক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। ভাষা যদি সাহিত্য ও অলঙ্কারপূর্ণ হয় তাহলে তা মানব মনকে অতিশয় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে তোলে। সাহিত্যের মাধুরী দিয়ে মানুষের মন সহজে জয় করা যায়। সাহিত্যের শৈল্পিক যাদুতে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও দর্শন মানব হৃদয়ে অধিক ক্রিয়াশীল হয়।

পৃথিবীতে যারা অগ্রাসন চালিয়েছে তারা প্রথমে ভাষা ও সাহিত্যকে আঘাত করেছে, তারপর নিজ চিন্তা-চেতনা, দর্শন-মতবাদ ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছে। বর্তমানে বাতিলপন্থী লোকজন ইসলামকে ঘায়েল করার জন্য ভাষা ও সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। সাহিত্যের চোরাবালিতে ইসলাম বিদ্বেষীরা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার নোংরা কর্ম করে যাচ্ছে। এসব বাতিলের মোকাবেলায় ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য বর্তমানে ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ম'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত ভাষা ও সাহিত্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি

শিক্ষার্থী যোগ্য আলেম হওয়ার পাশাপাশি যাতে ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠে, সেজন্য গঠন করা হয়েছে ‘তাদরীবুত ত্বালাবা’ নামে স্বতন্ত্র তাদরীব বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা। তার অধীনে শিক্ষার্থীরা লেখালেখি ও বক্তৃতা অনুশীলন করে থাকে। তাদরীব কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যোগ্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর। এজন্য সময়ে সময়ে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সৃজনশীল নানা আয়োজন করে থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো- সাহিত্য চর্চায় প্রতিভা বিকাশের জন্য দেয়ালিকা প্রকাশ।

মাদরাসা মহলে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দেয়ালপত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে ছাত্রদের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস জড়িয়ে থাকে। ছাত্রদের আগ্রহ-উদ্দীপনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে মা’হাদ বিগত বছর থেকে ‘মানারুস সাবীল’ ও ‘আলোর পথ’ নামে পৃথক দু’টি আরবী-বাংলা দেয়ালিকা প্রকাশ শুরু করেছে।

দেয়ালিকা দু’টি ছাত্রদের ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রোজনামা, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি ও কবিতাকানন ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। নবীন লেখকদের বাছাইকৃত লেখাগুলো সম্পাদনার মাধ্যমে এতে প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের লেখাগুলো সংগ্রহ করে দায়িত্বশীল ছাত্রদের সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়। ব্যাকরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সাহিত্যমান যাচাই ছাত্ররাই করে থাকে। পুরো দেয়ালিকার অক্ষরবিন্যাস, অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ প্রস্তুতিসহ যাবতীয় কাজ ছাত্ররা করে থাকে। বিষয়ের সাথে উপযুক্ত শিরোনাম ও প্রচ্ছদ নির্বাচনে ছাত্রদের সৃজনশীলতা ফুটে ওঠে।

এবারও সেই আঙ্গিকে ‘মানারুস সাবীল’ ও ‘আলোর পথ’ শিরোনামে দু’টি দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে ছাত্রদের বাছাইকৃত ও সম্পাদিত ছোটগল্প, রোজনামা, ভ্রমণ কাহিনি, শিক্ষণীয় রচনা ও কবিতা স্থান পেয়েছে। মাত্র কয়েক দিনে ছাত্ররা শৈল্পিক কারুকার্য দিয়ে সুন্দর একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে। তাদের সুন্দর হস্তলিপি ও হাতের চিত্রাকর্ষক অঙ্কনে দেয়ালিকা হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ ও অসাধারণ। দেয়ালিকা দু’টির যদিও এখন সূচনাকাল, তবুও ভাষা ও সাহিত্য মানের কিঞ্চিৎ হ্রাস হতে পারে। ছাত্রদের সাবলীল বর্ণনা, সুন্দর হস্তলিপি ও চিত্রাকর্ষক অঙ্কন পাঠককে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে তুলছে। অল্প ক’দিনে দেয়ালিকা দু’টি সবার মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এ দেয়ালিকা লেখালেখি ও সাহিত্য চর্চায় নবীন কলমযোদ্ধাদের পাথেয় হয়ে ওঠেছে।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন উপলক্ষে যে সকল উলামায়ে কেরাম মা’হাদে তাশরীফ এনেছেন তারা হলেন, মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা., মাওলানা শামসুল আলম সাহেব দা.বা. (বগুড়ার পীর সাহেব), মাওলানা খালিদ বিন ফরীদ

সাহেব দা.বা., মুফতী জাহিদুল ইসলাম সাহেব, পরিচালক, জামিআতু ইবরাহীম, ঝাউচর, সাভার, ঢাকা, হযরত মাওলানা শাহ তৈয়েব আশরাফ সাহেব দা.বা., ঢাকা, মুফতী ইবরাহীম হিলাল সাহেব দা.বা., মুফতী আবু সাঈদ সাহেব দা.বা., বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা., হযরতুল আল্লাম মুফতী ইয়াহইয়া সাহেব দা.বা., মুহতামিম মাসনা মাদরাসা যশোর, মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব, কাটাখালী হুযূর, রাজশাহী, মুফতী নূরুল আমীন সাহেব দা.বা., মাওলানা আকবর হুসাইন সাহেব দা.বা.- মুহতামিম, জামি’আ আরাবিয়া খাদিমুল ইসলাম (কমলাপুর মাদরাসা), পাইকগাছা, খুলনা, মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেব দা.বা.- মুফতী মনসুরুল হক দা.বা.-এর ছোট ভাই, মাওলানা শহীদুল ইসলাম সাহেব দা.বা.- নাযেমে দারুল ইকামা, জামি’আ আরাবিয়া খাদিমুল ইসলাম (কমলাপুর মাদরাসা)।

১৪৪৪-৪৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষের অভিভাবক সম্মেলন

১৭ মুহাররম মোতবেক ৫ আগস্ট শনিবার অনুষ্ঠিত হয় চলতি শিক্ষাবর্ষের অভিভাবক সম্মেলন। বেলা এগারোটা হতে পবিত্র কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় সম্মেলনটি। দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত সম্মেলন চলে। মা’হাদের নিজস্ব ভবন আল-মদীনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের প্রধান মেহমান ছিলেন, জামি’আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রবীণ মুহাদ্দিস এবং মা’হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার প্রধান মুফতী ও মজলিসে শূরার প্রধান হযরত মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

আলোচনা পর্ব শুরু হয় সোয়া এগারোটা থেকে। মা’হাদের সম্মানিত উস্তায হযরত মাওলানা সাঈদুর রহমান মুমিনপুরী দামাত বারাকাতুহুম কুরআন ও হাদীসের আলোকে দীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য ও দীনী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এরপর বয়ান পেশ করেন মা’হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার শিক্ষাসচিব হযরত মাওলানা মুফতী হাফিজুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম। তিনি তার আলোচনার মাধ্যমে ‘মাদরাসা পক্ষ’ ও ‘অভিভাবক পক্ষ’ এ দুই পক্ষের সমন্বিত চেষ্টাতেই যে একজন ছাত্র উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে সে বিষয়টি স্পষ্ট করেন।

অতঃপর মা’হাদ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষ হতে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন মা’হাদের সম্মানিত অর্থ সম্পাদক হযরত মাওলানা আরিফ হুসাইন সাহেব এবং মা’হাদের সভাপতি হযরত মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব।

বারোটা বিশ মিনিট থেকে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা মা’হাদের সম্মানিত মুদীর হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদুল আমীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম দীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অভিভাবকদের করণীয়গুলো তুলে ধরেন।

যোহরের নামাযের পর এ সম্মেলনের প্রধান মেহমান হযরতুল আল্লাম মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম নসীহত পেশ করেন। তিনি বলেন, বাবা সহযোগিতা করছে; কিন্তু মা করছে না, তাহলে সন্তান দুনিয়াতে আসবে কী করে? ঠিক উদ্ভাদগণ প্রাণান্তকর মেহনত-মুজাহাদা করছেন; কিন্তু অভিভাবকগণ সাহায্য করছেন না, এতে কিন্তু সন্তানকে আদর্শবান বানানো যাবে না। তাই সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। হযরতের বয়ান শেষ হওয়ার পর দু'আর মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ও তার শাখা প্রশাখা

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া নানা মুখী বিস্তৃত দীনী প্রকল্প বাস্তবায়নের অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে ২০১১ ঈসায়ী তার পথচলা শুরু করে। তার স্বপ্নের অনেক কিছুই বাস্তবতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে মা'হাদ তার নিজস্ব মূল তিনটি ক্যাম্পাসে দীনী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। একটি হলো, ঢাকা মহানগরীর নিজস্ব ভবন। দ্বিতীয়টি হলো তার পাশেই ভাড়া করা শিক্ষাভবন। তৃতীয়টি হলো বুড়িগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী প্রায় এক বিঘা জমিতে অবস্থিত মা'হাদের বিস্তৃত শিক্ষাঙ্গন। এছাড়াও মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার নিবিড় ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আরো দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে—

(এক) জামি'আ আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কমপ্লেক্স, মামাসার, বজ্রযোগিনী, মুন্সিগঞ্জ। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের মা'হাদের পরিচালনা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা কামরুল হাসান সাহেবের গ্রামের বাড়িতে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মা'হাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠানটিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য দীনী বাতিঘর হিসেবে কবুল করুন।

(দুই) আল-আমীন হিফযুল কুরআন মাদরাসা, শনির আখড়া, খানকা শরীফ রোড, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের মা'হাদের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের মুহতারাম চাচা আলহাজ্ব নূরুল আমীন সাহেবের নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত। মুহতারাম পরকালীন শান্তি সফলতার লাভের আশায় মাদরাসাটিকে মা'হাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আশা করি মা'হাদের পরিচালনায় মাদরাসাটি অনেক বড় একটি দীনী মারকাযে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সফলতা দান করুন।

Bmv#j mlqve

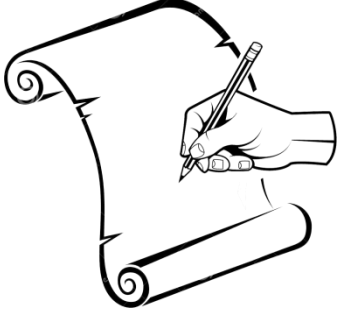
একটি দু'আর আবেদন

বাতায়ন দশম সংকলন প্রকাশের পর হতে আজ পর্যন্ত মা'হাদের বেশ কয়েকজন মুরব্বী, সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী ইত্তিকাল করেছেন, তাদের রুহের মাগফিরাত কামনায় পাঠকবর্গ সমীপে বিনীত দু'আর আবেদন করছি। —সম্পাদক

- মা'হাদ পরিবারের পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী, সর্বমহলে বরণীয় ও স্বীকৃত বুয়ুর্গ হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান রহ.।
- মা'হাদের মুহতারাম মুদীর সাহেব দা.বা.-এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা দলীলুদ্দীন আহমাদ রহ. (আজীবন সদস্য নম্বর ৯১) এবং তাঁর মমতাময়ী মাতা (আজীবন সদস্য নম্বর ৯২)।
- মা'হাদের পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের পিতা আলহাজ্ব আতাউর রহমান (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ১৯)।
- মা'হাদ পরিচালনা কমিটির আবাসন সম্পাদক মাওলানা মাসুম বিল্লাহ সাহেবের পিতা জনাব আবু নাসের ভূইয়া (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ৫৩) এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতা (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ৫৪)।
- মা'হাদের পরিচালনা কমিটির দফতর সম্পাদক মাওলানা আবু হুরাইরা সাহেবের সম্মানিত পিতা আলহাজ্ব আমিন মিয়া (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ১৫), তাঁর সম্মানিত মাতা (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ৫১) এবং তাঁর সম্মানিতা দাদী (আজীবন সদস্য নম্বর ৭১)।
- মা'হাদের শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা রাকীব হাসান সাহেবের সম্মানিত পিতা হাফেয মুহাম্মাদুল্লাহ রহ. (আজীবন সদস্য নম্বর ২০৬)।
- মা'হাদের স্থায়ী সদস্য জনাব নেহাল সিকদার সাহেব (স্থায়ী সদস্য নম্বর ৩৭)-এর সম্মানিতা মাতা।
- মা'হাদের হিসাব-রক্ষক জনাব মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দীক সাহেবের সম্মানিতা মাতা।
- মা'হাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব আব্দুল্লাহিল কাফী সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নম্বর ২৭)-এর সম্মানিত পিতা জনাব গোলাম রব্বানী।

তাঁদেরকে এবং আরো যারা ইত্তিকাল করেছেন সকলকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং মা'হাদকে তাঁদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

রোজনামচার পাতা



wKQz Abyf,wZ wKQz bmxnZ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঈসারী

গভীর রাত। তাহাজ্জুদ শেষে দু-হাত তুলে দু'আ করলাম। দু'আ শেষে সুবহে সাদিক দেখার আশায় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে পড়ে গেলো মুসান্না সাহেব হুযূর দা.বা.-এর কথা। তিনি একদিন সুবহে সাদিকের অপরূপ দৃশ্য দেখার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন। শৈত্য প্রবাহ চলছে। কনকনে শীত। হৃদয়ে অন্যরকম শীতল অনুভূতি। চারদিক নীরব নিস্তর্র। নেই মানুষের আনাগোনা। নেই পাখিদের কিচির মিচির। আমাদের মা'হাদের চারিদিকটা সবুজে ঘেরা। পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদিক উঁকি দিচ্ছে। বিক্ষিপ্ত মেঘমালা মৃদু লালিমা আবির ধারণ করছে।

সুবহে সাদিক আগেও দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এতোটা ভালো লাগার অনুভূতি হয়নি তখন। পরক্ষণেই চারিদিক থেকে মুয়াযযিনের কণ্ঠে সুমধুর আযান ধ্বনিত হতে থাকে। আমরা যথারীতি কুরআন তিলাওয়াত করে ফজরের নামায আদায় করলাম।

দরস শুরু হয়ে গেলো। প্রথম ক্লাস মুফতী মাহমুদ বিন ইলয়াস সাহেব দা.বা.-এর। হুযূর দরসে প্রবেশ করলে নীরব নিস্তর্র ও আলোকময় এক পরিবেশ তৈরি হয়। তিনি আমাদের নিগরান। আমাদের সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করেন। কখনো কোমল ও মিষ্ট ভাষায়, কখনো নসীহতের মাধ্যমে, কখনো মৃদু শাসনের মাধ্যমে। সেদিনও হুযূর মনোমুগ্ধকর কিছু কথা আমাদের বললেন। রুম পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে হুযূর কিছু মূল্যবান উপদেশ দান করলেন। উপদেশগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। হুযূর বললেন, তালিবুল ইলম যামানায় তোমরা চারটি বিষয় স্মরণে রাখবে- (১)

কোথায় এসেছি? (২) কী উদ্দেশ্যে এসেছি? (৩) কী করছি? (৪) পরিণতি কী হবে? আল্লাহ আমাদেরকে কোনো আবেদন ছাড়াই অসংখ্য অগণিত রহমত-নেয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। সুস্থ্যতার সম্পদ দান করেছেন। মুরব্বীদের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। এসব তাঁর কাছে চাইনি; তবুও দিয়েছেন। তবে ইলম এমন একটি মূল্যবান সম্পদ যা কষ্ট-ক্লেশ ও চেষ্টা সাধনা ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং ইলমের জন্য অনন্ত মেহনত-পরিশ্রম আবশ্যিক। সময়কে সম্পদ মনে করো। রত্নতুল্য সময়গুলোকে নষ্ট করো না। যে ইলম তুমি অর্জন করবে সে ইলমের উপর তুমি আমল করবে। নতুবা সে ইলমের নূর ও ক্রিয়া থাকবে না। শুধু কষ্ট করে কিতাবের বর্ণগুলো মুখস্থ করা হবে। এটা এক সময়ে আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন শত আক্ষেপ করেও কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

হুযূরের কথাগুলো আমার হৃদয়ে নাড়া দেয়। হুযূরকে আল্লাহ তা'আলা ইহকালীন ও পরাকালীন সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন দান করুন এবং আমাদের উপর তাঁর ছায়ায় দীর্ঘায়িত করুন।

জাহিদুল ইসলাম খুলনাবী
উজ্জ্বলী সালেস

Arðgayi C†'i w`b

১০ মার্চ ২০২১ ঈসারী

ঈদের দ্বিতীয় দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। মনটা কেমন যেন করছে। মনে আনন্দ নেই। কেন যেন মনটা ভারাক্রান্ত লাগছে। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশী আসলো। তার হাতে একটি ছাগল-কুরবানী দিতে হবে। এর আগে আমি কখনো কুরবানী দেইনি। কয়েকটি মুরগী জবাই করেছি হয়তো। তবুও কুরবানী দিতে রাজি হয়ে গেলাম। ছুরি হাতে সামনে অগ্রসর হলাম। হালকা ভয়, অদম্য আগ্রহ, অসীম প্রেরণা এবং দৃঢ় ইচ্ছা আমার ভিতরে কাজ করছে।

ভাইয়া ছাগল বেঁধে ধরলো। আমি ছাগলের গলায় ছুরি চালালাম। জবাই হয়ে গেলো। অল্প সময়েই অর্জিত হলো এক পরম অভিজ্ঞতা। কেটে গেলো মনের সকল ডর ভয়। রক্তে হাত রঞ্জিত হলো। আনন্দে মনট ভরে উঠলো। আমার পাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম জুনায়েদ। ও আমাকে বললো, Congratulations যায়েদ ভাই! কিছু সময় মিষ্ট রসিকতা করে হাতটা ধুয়ে নিলাম। মনটা আবার বিষন্ন হয়ে গেলো। ঈদের দিন এতো আনন্দের মাঝেও আনন্দ মনে হচ্ছে না।

দুপুরে মামার বাড়ি দাওয়াত। পরিবারের সবাই সেখানে যাবে। শুধু আমি যাবো না। আনন্দের দিনগুলোতে অনেক সময় আনন্দগুলো উপভোগ করা হয় না। ছোট মামা বলেন, জীবনের প্রতিটি সময় নিজের ইচ্ছা মতো কাটে না। জীবনে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। নিজের ইচ্ছাকে মাটি করতে হয়। মন মানে না। তবুও মনকে মানাতে হয়। দিল চায় না। তবুও দিলকে বোঝাতে হয়। ইচ্ছা হয় না। তবুও ইচ্ছাকে তৈরি করে নিতে হয়। আজ নিজের ইচ্ছাকে মাটি করে দীন ও ইলমের স্বার্থে মাদরাসায় যেতে হবে।

আবু আম্মু মামা বাড়ি গিয়ে দেখা করে চলে আসলেন। আম্মু আমাকে রুটি আর গরুর গোশত খেতে দিলেন। আমি অল্প করে খেয়ে নিলাম। একটু পরেই রওয়ানা হবো। আম্মুর চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আম্মুর মনেও অনেক বেদনা। আনন্দঘন এ ঈদের দিনে আদরের ছোট্ট ছেলের চলে যাওয়াটাকে যেন আম্মু মেনে নিতে পারছেন না। আবু তো আমাকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন, আজ না গেলে কি হয় না? কিন্তু মামা না করে দিলেন। আমার ব্যাগ গোছানো প্রায় শেষ। আম্মু বলে উঠলেন, যা বাবা! বিশ্ববরেণ্য আলেম হয়ে ফিরিস। হে আল্লাহ! আম্মুর এ দু'আকে তুমি কবুল করো।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ য়েদ
সানাবী আউয়াল

P>`agyLi iRbx

১৪ যিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরী

আজ ঈশার নামাযের পর বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি অপূর্ব এক আলোয় বারান্দাটা ভরে গেছে। কৌতূহলী হয়ে ছুটে গেলাম বারান্দায়। গিয়ে দেখি, শুধু আমাদের মা'হাদের বারান্দা নয়; এরকম শত শত বারান্দায় আছড়ে পড়ছে অপরূপ এ আলো। আজ যে পূর্ণিমা রাত তা আমার জানা ছিলো না। এ রাতে চাঁদ পূর্ণতা লাভ করে। পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয় তার রূপের বাহার। আমি অবাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি দূর নীলিমায় রূপের থালার মতো ভেসে বেড়ানো ওই আলো ঝলমল অপরূপ চাঁদের দিকে। নির্মল চাঁদের প্লিঙ্ক কোমল আলোক আভায বসুন্ধরা আজ বিমোহিত। চাঁদের চার পাশে কিছু তারকারাজিও জোনাকির মতো মিটিমিটি জ্বলছে। মাঝে মাঝে আবার চাঁদের জ্যোৎস্নাকে আড়াল করে সাদা কালো আবছা রঙের মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি যেন আজ তার অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নিজের সবটুকু রূপের বাহার মেলে ধরেছে। সে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম দৃশ্য। আজকের এ জ্যোৎস্না প্লাবিত অপূর্ব রজনীতে চাঁদের এমন অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে আমি হলাম বিম্বিত ও বিমোহিত, অভিভূত ও রোমাঞ্চিত। চাঁদকে এই অপূর্ব রূপের বাহার ও নির্মল আলো কে দান করেছে? চাঁদকে ঘিরে মিটিমিটি

তারকারাজি কে সাজিয়েছে? জ্যোৎস্না প্লাবিত ওই দূর আকাশে আবছা মেঘের ভেলা কে ভাসিয়েছে? তিনি এক আল্লাহ তা'আলা। এসব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি যদি এত সুন্দর হয়, হয় এত নিপুণ, এত নিখুঁত তাহলে তিনি কত সুন্দর, কত নিপুণ, কত নিখুঁত! সুবহানাল্লাহ...।

আবু বকর নাইদ
উস্তানী সালেস

`v`xgv!

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঈসায়ী

আজ হঠাৎ করে আমার প্রিয় সেই দাদীমার কথা মনে পড়ে গেলো, যার গল্প না শুনে রাতের বেলা ঘুম হতো না। আমি যখন হিফজ খানায় পড়ি তখনকার কথা। ঈদের পর মাদরাসায় ফিরবো। তখন দেখি দাদীমা হালকা অসুস্থ। আমি দাদীমা থেকে বিদায় নিয়ে মাদরাসায় চলে আসি। দিন কাল ভালোই কাটছিলো। একসময় কুরবানীর ঈদের সময় চলে আসে। কুরবানীর ঈদের ছুটি আর মাত্র সাত দিন বাকি। বাবা আমাকে আকস্মিকভাবে ফোন দিয়ে বললেন, তুমি আজই বাড়িতে চলে আসো। তোমার দাদী খুবই অসুস্থ। তোমাকে দেখতে চাচ্ছে একবার। বাবার কথা মতো হুয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি আমার দাদীমা খুবই মুমূর্ষু অবস্থায় ছোট একটি খাটের উপরে শুয়ে তাসবীহ জপছে। দাদী আমাকে দেখা মাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাথা কাছে টেনে বললো, নাতীগো! তরে একবার দেহনের লেইগ্যায় মনে হয় বাইচ্যা রইছি। বলছে আর কাঁদছে। আমার দাদীমাও কাঁদছেন আমিও কাঁদছি। আমার আজও মনে পড়ে আমার দাদীমার শেষ কথাটা। তিনি বলেছিলেন, নাতীগো! জীবনে কখনো লেখা পড়া ছাড়িস না। পড়া লেখা শিখবা এবং অন্যরে শিখাইবা। আর আমি মইর্যা যাওনের পর জানাযাটা পরাইবা। পর দিন যোহরের নামায পড়ে ছোট চাচার ঘরে গেলাম। যাওয়া মাত্রই মা ডাকাডাকি শুরু করলো। গিয়ে দেখি, মা'র চোখ দুটো ছলছল করছে। আমাকে বলছে, তোর দাদীর অবস্থা তো একেবারেই খারাপ। দাদীর পাশে গিয়ে প্রথমে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলাম। এরপর আরো কিছু দু'আ দুরূদ পাঠ করলাম। এরই মধ্য দিয়ে দাদীমা আমাদেরকে আলবিদা জানিয়ে নিষ্ঠুর এ পৃথিবী থেকে পরজগতে পাড়ি জমালেন। আল্লাহ! আমার দাদীমাকে তুমি ভালো রেখো।

ইখলাসুর রহমান
উস্তানী সানী

Avcb wVKvbvi mÜv#b

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী

ফজর নামায শেষ হলো। মুসল্লা উঠিয়ে দরসে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এসময় রাজবাড়ী হুযূর এসে বললেন, তোমাদেরকে মা'হাদের নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। দ্রুত নিচে চলে যাও। আমরা খুব খুশি হলাম। কাল বিলম্ব না করে বড় ভাইদের সাথে নিচে চলে গেলাম। সবাই নিচে চলে এলে আমরা সকলে মা'হাদের নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ডান বাম করে করে বেশ খানিকটা অচেনা পথ পেরিয়ে অবশেষে মা'হাদের আসল ঠিকানা ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি মুদীর সাহেব হুযূর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে মুচকি হাসলেন। হুযূর আমাদেরকে হাত দ্বারা মা'হাদের জায়গার সীমারেখা দেখালেন। ভূমিটি প্রলম্বিত আগাছা-পরগাছায় পূর্ণ হয়ে আছে। এগুলো আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। দেখলাম একেকটা গাছ আমাদের চেয়ে বড়। কীভাবে এ জঞ্জাল পরিষ্কার করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মুদীর সাহেব হুযূরের পাশে কুমিল্লার হুযূর ছিলেন। মুদীর সাহেব বললেন, যেহেতু হুযূর এ এলাকার ইমাম তাই হুযূর দু'আ করবেন। এরপর কুমিল্লার হুযূর দু'আ করলেন। এরপর মুদীর সাহেব হুযূর উপড়ে ফেলার জন্য একটি গাছ ধরলেন। কিন্তু গাছটা ভালোভাবে উঠলো না। তখন এক ছাত্র ভাই বটকা টান দিয়ে গাছটি উঠিয়ে ফেললেন। এ দেখে সবাই গাছ উঠাতে ঝাপিয়ে পড়লো। যে যেভাবে পারছে গাছ উঠাতে শুরু করছে। একসময় আমিও নেমে পড়লাম। সবার সাথে কাজ করতে বেশ ভালো লাগছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের এক ভাইয়ের হাত একটু কেটে গেলো।

আমরা সবাই মিলে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম। এর মধ্যে ইফতা বিভাগের বড় ভাইয়েরা এসে পড়েছে। তখন মুদীর সাহেব হুযূর আমাদেরকে একত্রিত হতে বললেন। সবাই জমা হয়ে গেলে মুদীর সাহেব বললেন, তোমরা তো বেশ দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলেছো। এখন নাযেম সাহেব হুযূর দু'আ করবেন। এরপর তোমরা মাদরাসায় চলে যাবে। আর ইফতা বিভাগের ছাত্ররা বাকি কাজ সম্পন্ন করবে। দু'আ শেষ হলে আমরা মা'হাদের ভাড়াকৃত ভবনে ফিরে গেলাম। আজ সেসব সুখময় স্মৃতি হয়ে জ্বলজ্বল করছে। মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে এ কথা ভেবে যে, মা'হাদের নিজস্ব ভবন তৈরিতে আমাদের কচি হাতের ছোঁয়া আছে। হে আল্লাহ! তুমি মা'হাদকে অনেক বড় করে দাও।

আবু সালেহ
উস্তানী সানী

eo#`i +mvneZ mdjZvi ivRc_

১১ জানুয়ারি ২০২৪ ঈসাবী

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হলো। নিয়মানুযায়ী মাদরাসার পক্ষ থেকে দশ দিনের ছুটি হলো। প্রায় সব ছাত্রই মা-বাবার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে

আপন আপন ঠিকানায় চলে গিয়েছে। রয়ে গেছে মাত্র ১৫ থেকে ২০ জন। ছুটিতে এদের মাদরাসায় থাকার যিম্মাদারি ছিলো। মূলত আমাদের সম্মানিত উস্তাদগণ আমাদের মা'হাদের স্বার্থে এ নিয়মটি চালু করেছেন। যে কারণে কোনো ছুটিতেই মা'হাদ একেবারে শূন্য থাকে না।

ছুটিতে আমার মা'হাদে থাকার যিম্মাদারি ছিলো না; তবুও উস্তাদ ও মা'হাদের মহব্বতে এবং নিজের উপকারার্থে সানন্দে মাদরাসায় রয়ে গেলাম। ১০টি দিন মাদরাসায় কাটানোর ফলে আমার যে কত উপকার হয়েছে তা আসলে বলে কিংবা লিখে বুঝাবার সাধ্য আমার নেই। নানা ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আর আমলী মশক ইত্যাদির মাধ্যমে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। তবে যা কিছুই অর্জন হোক না কেন তার সবই সম্ভব হয়েছে আমাদের সম্মানিত মুদীর সাহেব হুযূর দা.বা.-এর সোহবত এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেব হুযূর দা.বা.-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে।

মুদীর সাহেব হুযূরের বাসা মা'হাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই তিনি রাতে মা'হাদের অবস্থান করতেন এবং শেষ রাতে আমাদের জাগিয়ে দিতেন। যখন সকলের তাহাজ্জুদ শেষ হতো তখন তিনি আমাদের সবাইকে একত্রিত করে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে দু'আ করতেন আর চোখের পানি ফেলতেন। শুধু তাই নয়; বরং তিনি ফজরের নামাযের পর আমাদের নিয়ে বসতেন এবং অনেকক্ষণ ইসলামী আলোচনা করতেন। আহ! কতই না মনোমুগ্ধকর ছিলো সেই আলোচনা! আর কতইনা আত্মশুদ্ধিময় ছিলো সেই মুযাকারা! আল্লাহ তা'আলা হযরতের ছায়াতে আমাদের উপর আরো দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

একবারের ঘটনা, মুদীর সাহেব হুযূর আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, আচ্ছা বলোতো, সীরাতে মুস্তাকীম কোনটি? আমরা কিছুই বললাম না। কারণ আল্লাহওয়ালাদের প্রশ্নের উত্তর স্বভাবিক হয় না; তাতে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় লুকিয়ে থাকে। এরপর তিনি যমীনে একটি সরল রেখা আঁকলেন এবং তার ডানে-বামে আরো কিছু শাখাগত রেখা এঁকে দেখালেন। তারপর বললেন, এই সরল রেখাটি হলো সীরাতে মুস্তাকীম; সরল পথ। আর বাকি সবগুলো রেখা বা পথের মাথায় একজন করে শয়তান বসা রয়েছে। যে ব্যক্তি এ সোজা পথ দিয়ে চলে বা চলতে চায় তাকে সে হাতছানি দিয়ে গোনাহের দিকে ডাকতে থাকে। কখনো দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট করে, আবার কখনো নারীর লোভ দেখিয়ে, আবার কখনো বিষাক্ত ভাইরাস মোবাইলের সুরত ধারণ করে মানুষকে গোনাহের দিকে আহ্বান করতে থাকে। সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে ঠিক এভাবেই রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সীরাতে মুস্তাকীম কোনটি?

মোদাকথা হলো, ছুটির সেই দিনগুলো বড়ো সুন্দর কেটেছে এবং চমৎকার একটি আমলী পরিবেশে কেটেছে। বাড়িতে থাকলে যেটার চার আনাও সম্ভব ছিলো না। আর শেষের কয়েকটি দিন তো একেবারে নূরানী পরিবেশে কেটেছে। কারণ তখন কিশোরগঞ্জের পীর সাহেব হুযূর তার মুরীদদের সঙ্গে আমাদের মা'হাদে নফল ই'তিকাহে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। সেই দিনগুলো কখনো ভোলার নয়। মৃত্যু অবধি সেই দিনগুলো জীবনের ক্যানভাসে আঁকা থাকবে।

সাথী ভায়েরা! পরিশেষে তোমাদের কাছে আরয় থাকবে, তোমরা উস্তাদদের সান্নিধ্য ও বড়দের ছায়ায় গনীমত মনে করো। কারণ এগুলোই আমাদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ ও জীবন পথের পাথর।

মুহাম্মাদ আজীজুল হক
উস্তানী সালেস

Avgv#`i wcÖq cÖ#dmi nhiZ in.

১৫ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বিসারী

আমাদের প্রিয় প্রফেসর হযরত হামীদুর রহমান সাহেব। তিনি আজ রহমাতুল্লাহি আলাইহ। এই তো সেদিনও তাঁর নামের সাথে এ সংযুক্তি ছিলো না! তিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষ বানালেন। অন্ধকে চলার পথ দেখালেন। পথহারাকে পথের দিশা দিলেন। দিকভ্রান্তকে দিকনির্দেশনা দিলেন। ঘুমন্তকে জাগিয়ে তুললেন। অলসকে উদ্যমী করলেন। হতাশাগ্রস্তকে আশাবিত্ত হতে শেখালেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরার সবক দিলেন। দুনিয়ার মোহাবিষ্ট মানুষকে আখেরাত চেনালেন। তিনি দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আল্লাহর দিকে ছুটে চলার নসীহত করলেন। লোভীকে নির্মোহ হতে বললেন। তিনি মানুষকে খাঁটি মানুষ হওয়ার তা'লীম দিলেন। সরে যমীনে নববী আদর্শের বীজ বপন করলেন। মানুষকে কুরআন শেখানোর মিশনে ব্রতী হলেন। নববী আদলে তাদেরকে গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন নববী আদর্শের এক বাস্তব নমুনা। তিনি এমনই ছিলেন। এমন করেই তিনি নিজের ৮৫ বছরের ছোট্ট জীবনটাকে ফুলে ফলে সাজিয়ে যাচ্ছিলেন।

তারপর। একদিন হঠাৎ তিনি রফীকে আ'লার ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি চলে গেলেন। সত্যিই তিনি চলে গেলেন! একেবারেই চলে গেলেন! চলে গেলেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রফেসর হযরত রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা রাহমাতান ওয়াসিআহ। লাখো বনী আদমকে, ভক্ত-মুরীদান ও বন্ধু-আহবাবকে এবং কাছের দূরের প্রিয়জনদেরকে এতীম করে, সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি চলে গেলেন তার মাহবুবে আ'লার কাছে। আমরা হারালাম

আমাদের একজন প্রিয় রাহবারকে। এক প্রিয় বাতিঘরকে। তিনি আর আসবেন না। তাকে আর কখনোই দেখতে পাবো না— একথা ভাবতেই মনের অজান্তে আঁখিযুগল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বুকভরা হাহাকার নিয়ে কান্না করতে ইচ্ছে করে। কান্নারাও যেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে প্রিয়জনের বিরহে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে! কত মানুষ যে আজ তার বিয়োগ-ব্যথায় শোকাবুজ জানা নেই। সকলের যেন তিনি এক অঘোষিত অভিভাবক ছিলেন। আজ তারা এতীম। আমরাও এতীম। আমাদের সবাইকে এতীম করে তিনি চলে গেলেন!

পরিশেষে পরম করুণাময়, মেহেরবান রাব্বের কারীমের কাছে এক বুক আশা নিয়ে মিনতি জানাই, তিনি যেন তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে মাগফিরাতে কামেলা দান করেন। রহমতের চাদরে আবৃত করে নিজ কুদরতী হাতে আদর করে শান্তির ঘুম পাড়িয়ে দেন।

আমরা বারবারই ভুল করি। ভুল করাটাই যেন আমাদের নিয়মিত কাজ। আমাদের থেকে বিদায় নেন অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, ওলী-আউলিয়া, হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং আল্লাহর একান্ত বুয়ুর্গ বান্দাগণ। আমাদের কাছে রেখে যান কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত এক অনুপম জীবনাদর্শ। রেখে যান এক উসওয়ায়ে হাসানাহ। তবুও আমরা তাদের জীবনের দীপাধার থেকে আলো গ্রহণ করি না। তাদের অনুসরণকে নিজের দৈনন্দিন মা'মূল বানাই না। তাই আমরা বারবার ব্যর্থ হই। বারবার হোঁচট খাই। পিছিয়ে যাই বারবার। প্রফেসর হযরতকে নিয়ে আমাদের যেন ভুল না হয়। আমরা যেন উদাসীন না হই। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন নববী আদর্শে জীবন পরিচালনার হাজারো পাথর। যাতে আমাদের জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হয়— সাফল্যমণ্ডিত হয়। আল্লাহ পাক আমাদের তাউফীক দান করুন। আমীন।

ইহসানুদ্দীন
ইফতা (২য় বর্ষ)

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা'র
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

মা'হাদ সুদূরপ্রসারী চতুর্থ শ্রেণী শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। মা'হাদ ইসলামী ফাতওয়া ও উচ্চতর গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে তার কার্যক্রমের সূচনা করলেও ইতিমধ্যেই মকতব, নাযেরা, তাহফীযুল কুরআন ও কিতাব বিভাগের প্রথম থেকে ষষ্ঠ জামাআতে (জামাআতে তাইসীর থেকে জামাআতে শরহেজামী)-এর মাধ্যমে তা সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কিতাব বিভাগের সপ্তম জামাআতে সানাবী সানী (জামাআতে শরহেবেকায়া) খোলা হবে ইনশাআল্লাহ। মা'হাদের চলমান বিভাগগুলোতে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। ভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত সেসব তথ্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো-

দুই বছর মেয়াদী ফিকহ ও ফাতওয়া বিভাগ

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) হিদায়া আখেরাইন (২) নূরুল আনওয়ার (৩) বিষয়ভিত্তিক আরবী-বাংলা প্রবন্ধ
(৪) মৌখিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে।

ভর্তির যোগ্যতা

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে তাকমীল জামাআতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে জায়িদ জিদ্দান (প্রথম বিভাগ)-এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

ইবতিদায়ী আউয়াল (জামাআতে তাইসীর)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধ নাযেরা পাঠ (২) উর্দু কায়িদা (৩) বাংলা পড়া ও লেখা

ইবতিদায়ী সানী (জামাআতে মীযান)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) তাইসীরুল মুবতাদী (২) ফারসী কি পেহলী কিতাব (৩) এসো আরবী শিখি (১ম খণ্ড)

উস্তানী আউয়াল (জামাআতে নাহ্বেমীর)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) মীযান মুনশাঈব/ইলমুস সরফ (১ম ও ২য় খণ্ড) (২) এসো আরবী শিখি (২য় খণ্ড)

উস্তানী সানী (জামাআতে হিদায়াতুল্লাহ)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) নাহ্বেমীর (২) ইলমুস সরফ (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)/পাঞ্জগাঞ্জ (৩) রওয়াতুল আদব

উস্তানী সালেস (জামাআতে কাফিয়া)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) হিদায়াতুল্লাহ (২) ইলমুস সীগা

সানাবী আউয়াল (জামাআতে শরহেজামী)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) কাফিয়া (২) মুখতাসারুল কুদুরী

আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন সংযোজন : সানাবী সানী (জামাআতে শরহেবেকায়া)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

- (১) শরহেজামী (২) কানযুদ্বাকাইক

তাহফীযুল কুরআন বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

- (১) তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে সক্ষম হতে হবে।

- (২) বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে।

নাযেরা (দেখে কুরআন পাঠ) বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

- (১) তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ আমপারা পাঠে সক্ষম হতে হবে।

- (২) বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে।

নূরানী মকতব (প্রাথমিক শিশু শ্রেণী) বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

ছাত্রের বয়স ৫ বছর হতে অনূর্ধ্ব ১১ বছরে সীমিত হতে হবে।

জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ও বয়স্কদের জন্য 'ফরযে আইন কোর্স'

দীনী জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্যই আবশ্যিক। যারা জাগতিক, পারিবারিক, চাকুরী ব্যবসাসহ নানা ব্যস্ততার কারণে ফরয পরিমাণ দীন শিক্ষতে পারছেন না তাদের জন্য এই কোর্সটি চালু করা হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যার দু'টি শিফটে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে।

বি.দ্র. মা'হাদের শিক্ষাবর্ষ ও নতুন ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ থেকে।

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ

শিক্ষা দফতর

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া

(আল-মদিনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স)

পুট-০২, রোড-০৮, ব্লক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৯৪০৩৭৬৭৪০, ০১৯৬৩৫৬৩৩০০

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা'র মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

হযরত মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা.

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার (করাচীর হযরত) রহ.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী ইবরাহীম হেলাল দা.বা.

খলীফা, মুহিউস সুল্লাহ হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.
নায়েবে মুহতামিম ও মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.

খলীফা, মুহিউস সুল্লাহ হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.
নায়েবে মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী আহমাদুল্লাহ দা.বা.

খলীফা, হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.
মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়ার সম্মানিত পরিচালনা পরিষদ

১. মাওলানা মাসউদুর রহমান	সভাপতি
২. মাওলানা কামরুল হাসান	সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা শামসুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
৪. মুফতী মাহমুদুল আমীন	সেক্রেটারি
৫. মাওলানা মাহবুবুর রহমান	সহকারী সেক্রেটারি
৬. মাওলানা আরিফ হুসাইন	অর্থ সম্পাদক
৭. মাওলানা গাজী নুসরাতুল্লাহ	প্রকাশনা ও দাওয়াহ সম্পাদক
৮. মাওলানা আবু হুরাইরা	দপ্তর ও শাখা সম্পাদক
৯. মাওলানা রাকিব হাসান	শিক্ষা ও মানোন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক
১০. মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম	মানবকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্পাদক
১১. মাওলানা মাসুম বিল্লাহ	আবাসন সম্পাদক

১২. মাওলানা এম. এরশাদ উল্লাহ আকমাল	নির্মাণ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. জনাব ওয়ালিউল্লাহ রাকিবল	সদস্য
১৪. জনাব ওবায়দুর রহমান ওসামা	সদস্য
১৫. জনাব মুহাম্মাদ আজহার হোসেন	সদস্য

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা'র সম্মানিত আসাতিয়ায়ে কেরাম

০১. মাওলানা মুফতী ইবরাহীম হাসান	প্রধান মুফতী
০২. মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ	উসতযুল ইকতিসাদিল ইসলামী (ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক উস্তাদ)
০৩. মাওলানা মুফতী মাহমুদুল আমীন	মুদীর (পরিচালক)
০৪. মাওলানা মুফতী হাফিজুর রহমান	আমীনুত তা'লীম (শিক্ষাসচিব)
০৫. মাওলানা রাকীবুল হাসান	মুদাররিস (শিক্ষক)
০৬. মাওলানা গাজী নুসরাতুল্লাহ	মুদাররিস (শিক্ষক)
০৭. মাওলানা মাহমুদুল হাসান	মুঈনে মুদীর
০৮. মাওলানা মুফতী মাহমুদ বিন ইলিয়াস	মুদাররিস (শিক্ষক)
০৯. মাওলানা সুহাইল আহমাদ	মুদাররিস (শিক্ষক)
১০. মাওলানা আমীরুল ইসলাম	মুদাররিস (শিক্ষক)
১১. মাওলানা হুসাইন আহমাদ	মুদাররিস (শিক্ষক)
১২. মাওলানা সাঈদুর রহমান	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৩. মাওলানা মাসীহুল্লাহ মুসান্না	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৪. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৫. মাওলানা হাদিল ইসলাম	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৬. জনাব ওবায়দুর রহমান ওসামা	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৭. জনাব খলীলুর রহমান	মুদাররিস (শিক্ষক)
১৮. হাফেয মাওলানা উমর ফারুক	মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
১৯. হাফেয শফীকুল ইসলাম	মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
২০. হাফেয শফীক বিন আব্দুর রহীম	মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
২১. হাফেয সাদ বিন ইমদাদ	মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
২২. হাফেয যাকির হুসাইন	মুদাররিস (শিক্ষক); তাজবীদুল কুরআন বিভাগ
২৩. হাফেয আতাউর রহমান	মুদাররিস (শিক্ষক); নূরানী মকতব বিভাগ
২৪. হাফেয আব্দুল করীম	মুদাররিস (শিক্ষক); নূরানী মকতব বিভাগ
২৫. মাওলানা মাসউদুর রহমান	মুদাররিস (শিক্ষক); কলমারচর শাখা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

২৬. মাওলানা আবু য়ায়েদ	মুদাররিস (শিক্ষক); কিতাব বিভাগ, কলমারচর শাখা
২৭. হাফেয রফীকুল ইসলাম	মুদাররিস (শিক্ষক); হিফযুল কুরআন বিভাগ, কলমারচর শাখা
২৮. হাফেয মাসুম বিল্লাহ	মুদাররিস (শিক্ষক); তাজবীদুল কুরআন বিভাগ, কলমারচর শাখা
২৯. হাফেয আব্দুর রায্যাক	মুদাররিস (শিক্ষক); নূরানী মকতব বিভাগ, কলমারচর শাখা
৩০. মাওলানা আহমাদুল্লাহ	মুদাররিস (শিক্ষক); নূরানী মকতব বিভাগ, কলমারচর শাখা

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা'র সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দের নাম

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব	বাইতুল মুয়াযযম মসজিদ কোয়ার্টার, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর
০২	মুফতী মাহমুদুল আমীন	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
০৩	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪	মাওলানা আবু হুরায়রা	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৫	মাওলানা মাসউদুর রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
০৬	মাওলানা রাকীব হাসান	'আবাহন নিকসতি' বাড়ি-১৫, রোড-৮, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
০৭	মাওলানা আরিফ হোসাইন	২২ তন্নাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
০৮	মাওলানা গাজী নুসরাতুল্লাহ	'আবাহন নিকসতি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
০৯	মাওলানা কামরুল হাসান	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
১০	মাওলানা মো. মাসুম বিল্লাহ	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
১১	মুফতী রহমত উল্লাহ	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
১২	মাওলানা শামসুল ইসলাম	রোড-৩, বাড়ি-২৫, হিরাবিল আ/এ, সিদ্দিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
১৩	মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম	'আবাহন নিকসতি' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৪	মাওলানা এম. এরশাদ উল্লাহ আকমাল	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫	আলহাজ্ব আমিন মিয়া	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৬	জনাব ফেরদাউস মাজীদ	'রেডউড' বাড়ি- ৮৭, রোড- ২৫/এ, ব্রক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১৭	জনাব সৈয়দ এনায়েতুল্লাহ	২০০, বনবীথি আবাসিক এলাকা, (সৈয়দ আব্দুল মোমেন আই হসপিটাল), মৌলভীবাজার
১৮	জনাব মো. আব্দুস সালিম	মুন্ডার বাড়ি, উত্তর চাড়ীপুর, ফেনী
১৯	জনাব আলহাজ্ব আতাউর রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
২০	জনাব আলহাজ্ব মনোয়ারা রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
২১	জনাব হাজী আব্দুস সাত্তার	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
২২	জনাব কাজী ওয়াছিউদ্দিন	৩০, আব্দুল আজিজ লেন, লালবাগ, ঢাকা
২৩	জনাব মুহাম্মদ শরফুদ্দীন	পি.ডব্লিউ.পি, অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা
২৪	জনাব সাদাকা ত হোসেন চৌধুরী	বাসা-৫০, রোড-৩, রূপালী হাউজিং, সেকশন-৩, মিরপুর, ঢাকা
২৫	জনাব ওয়ালিউল্লাহ রাব্বিল	২১ নং বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
২৬	জনাব আসফাক আহমেদ	৩৭০ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭
২৭	জনাব এস.এম আব্দুল্লাহিল কাফী	১৩/বি দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
২৮	জনাব রোকিয়া হোসেন	২২ তন্নাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
২৯	জনাব এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ	১৩/এ, রোড-২ ব্রক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৩০	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩১	জনাব মুহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম সোহেল	৬৭/এ, রোড- ০৩, ঢাকা রিলে এস্টেট, কাটাসুর, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩২	জনাব এ.এস.এম হুমায়ুন কবীর	নয়নতারা-১, ২ রোড- ৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
৩৩	জনাব মো. আনিসুর রহমান	৩০/১৮ তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩৪	জনাব মাহমুদুর রহমান (রাজীব)	গাইবান্ধা
৩৫	জনাব মো. আবুল হাসান	৩৮/বি, ময়াকানন, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
৩৬	জনাব নূর মোহাম্মদ	৬১৯/বি, বাইতুল আমান হাউজিং, রোড নং ৪, আদাবর, ঢাকা
৩৭	জনাব ডা. মো. ওমর ফারুক	৮১-এ আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা
৩৮	জনাব উম্মে সালমা আক্তার	রোড-৩৪, বাড়ি-৩, উত্তরা, ঢাকা
৩৯	জনাব ফিরোজ মাহমুদ	'আবাহন নিকসতি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৪০	জনাব মাওলানা সালেহ আহমেদ	৪০/এ/১ দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
৪১	জনাব মুহিউদ্দীন আহমাদ	ব্রক- ই, রোড- ০১, হাউজ- ৩১, ইস্টার্ন হাউজিং, রূপনগর, মিরপুর-১, ঢাকা
৪২	জনাব মো. মহসিন সরকার	রাজারবাগ, ঢাকা
৪৩	জনাব মো. মেহেদি হাসান সরকার	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
৪৪	জনাব আব্দুল গফুর	ফ্লাট-৫/এ, এস.ই.এল, আলতাফ গ্যারি, ২৫৯ এলিফান্ট রোড, ঢাকা
৪৫	জনাব হাজী মো. রাজা মিয়া	২১ নং বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৬	জনাব এলাহী খলিফা	মিরপুর, ঢাকা
৪৭	জনাব আনোয়ার হোসেন	রাজিয়া সুলতানা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৮	জনাব আলহাজ্ব হাসিনা বেগম	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
৪৯	জনাব মো. আনোয়ার হোসেন	২২ তন্নাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা
৫০	জনাব মাওলানা একরামুল হক	১৩১ আজিমপুর রোড, রংপুর হাউজ
৫১	জনাব আলহাজ্ব মনোয়ারা বেগম	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫২	জনাব ইকবাল আহমেদ	ক্রিংহাম, ইংল্যান্ড
৫৩	জনাব আলহাজ্ব আবু নাসের ভূঁইয়া	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
৫৪	জনাব আলহাজ্ব ফাতেমা বেগম	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
৫৫	জনাব মাওলানা মিসবাহুল ইসলাম	৩৬/১-ডি, কালুনগর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা
৫৬	জনাব শোয়াইব আহমদ	নুসুল্লাহার ভিলা, ১২৯ দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা
৫৭	জনাব শাহনূর ইসলাম	প্রযত্নে: মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম
৫৮	জনাব নূর আহমদ	৪৬/৬/এ জি-৩ নতুন রাস্তার মোড়, বিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
৫৯	জনাব হাসিনা খাতুন	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিক্কু-২, ঢাকা-১২২৯
৬০	জনাব ওবায়দুর রহমান (ওসামা)	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
৬১	জনাব ফকীর কামাল উদ্দীন	৭৬/ডি আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
৬২	জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান	ডি/৬০ তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
৬৩	ড. আরজুমন্দ আরা বানু	ফ্লাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্টেটিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
৬৪	জনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান	ফ্লাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্টেটিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
৬৫	জনাব হোসাইন আহমদ	২০বি/৪ টুইন টাওয়ার, শান্তিনগর, ঢাকা
৬৬	মরহুম হাজী আলতাফ হোসেন	১১৭ গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৬৭	জনাব মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন	বাড়ি- ৪৮, রোড- ০৭, রক্ষিক হাউজিং, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা
৬৮	জনাব মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম	সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা
৬৯	রিজওয়ানা রুকাইয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭০	জনাব তানভীর আসিফ	৭৬/২/ই/২৬সি উত্তর যাত্রাবাড়ি, বিবিরবাগিচা, ঢাকা-১২০৪
৭১	জনাব মুহাম্মাদ কামরুল হাসান	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা
৭২	দিলরুবা ইয়াসমিন	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা
৭৩	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	৪১/১৯ সি, চান মিয়া হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭৪	মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.	জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৫	জনাব মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান	বাসা-১৩, রোড-১০, ব্রুক-এ, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭৬	জনাব আনিসুর রহমান	ফ্ল্যাট-৭/বি, ২/২বি, আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৭	জনাব জহিরুল হক ভূঁইয়া	ফ্ল্যাট-বি-২ বাড়ি-১১৫, সড়ক-৯/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা
৭৮	জনাব সৈয়দ ওয়ালিউল হক	২৭১/২৯, নিরিবিলি হাউজিং, শংকর, ঢাকা-১২০৭
৭৯	জনাব আরিফ আহমেদ	৬০/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা
৮০	জনাব মুহাম্মাদ বাবুল মিয়া	দড়ি ভেলানগর, বি-বাড়িয়া
৮১	মরহুমা হাসিনা বেগম	৩৭নং গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮২	জনাব এ্যাড. মুহাম্মাদ মতিউর রহমান	বাড়ি- ২০, রোড-০১, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৮৩	জনাব আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল	বাড়ি- ২০, রোড-০১, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৮৪	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাই	গ্রাম- ইমামনগর, পোস্ট- জয়মটপ, থানা- সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ
৮৫	সানজিদা বেগম	গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৬	জনাব মুহাম্মাদ রিয়াজুদ্দীন মাসুম	১০/১ কালু নগর, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৭	জামিলা খাতুন	গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৮	জনাব আনোয়ার হোসেন	৪/১ শিকারীটোলা, গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৯	সুখমা আরজুমন্দ প্রান্তি	ফ্ল্যাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেট রোড, ঢাকা-১২০৫
৯০	রায়হান মাহমুদ হাননান	ফ্ল্যাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেট রোড, ঢাকা-১২০৫
৯১	জনাব মুহাম্মাদ রুহুল আমীন	আহম্মদিয়া স্কুল রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা সিটি, খুলনা
৯২	মাওলানা আরিফ বিল্লাহ	ভবানীপুর, জিয়ানগর, পিরোজপুর
৯৩	মুহাম্মাদ ওয়াহিদুজ্জামান	২/৩ মনেশ্বর রোড (কুলাল মহল মসজিদের সাথে), হাজারীবাগ, ঢাকা
৯৪	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	গ্রাম- বীরকোট, পোস্ট- কানকির হাট, থানা- সেনবাগ, নোয়াখালী
৯৫	মুহাম্মাদ নাসীর মুনিম হুসাইন	হাউজ- ২৭, রোড- ১১৪, ব্রুক- সি.ই.এন, গুলশান-২, ঢাকা
৯৬	মরহুম আব্দুর রশীদ	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৭	মাফিয়া খাতুন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৮	জনাব গোলাম মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৯	সাবেকুন নাহার	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১০০	নূরুদ্দীন মাহমুদ রাইয়ান	২১ নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০১	মুহাম্মাদ ফায়েজুর রহমান বিশ্বাস	৬/১২, ব্রুক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১০২	মিসেস দিল মাহমুদা কেয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০৩	মুহাম্মাদ বদরুল মুনির জাহাঙ্গীর	বাসা- ৮২, রোড- ০২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০৪	ডা. ফাইজুল ইসলাম	বাসা-৩, রোড- ৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

বাতায়ন একাদশ সংকলন, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪

১৪৭

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১০৫	এম. এস. আহমাদ আলী	বাসা-১৯, ব্রুক-বি, ৪০ ফিট আর্ভিনিউ রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০৬	মরহুম আব্দুল আজীজ	৮/০ এমরান আজিজ, ৬৬/৩ আক্কা পাড়া, বজলুর মোড়, কুষ্টিয়া
১০৭	জনাব আজহার হোসেন	৮/০ মুহাম্মাদ মাহমুদ হোসেন, ১২/১, পি.সি. ব্যানার্জী লেন, সিংটোলা, ঢাকা-১১০০
১০৮	আনিকা ফেরদৌস	ফ্ল্যাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেট রোড, ঢাকা-১২০৫
১০৯	জনাব মকবুল হোসেন	মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১১০	মরহুমা রাবেয়া বেগম	১৩/১৭/বি, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১১১	এ কে এম বজলুর রহমান	১৩/১৭/বি, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১১২	সাফিনা হক	২২ তন্নাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
১১৩	জনাব মচির আহম্মদ মজুমদার	বাসা-৮৩ ৯, ফ্ল্যাট- ৫/বি রোড- ৩, ব্রুক-সি সেকশন-০৬ মিরপুর, ঢাকা
১১৪	মুহাম্মাদ দবিরুল ইসলাম	১/সি বাড়ি-২ খন্দগর আবাসিক এলাকা-১ সাহেবতা মোড়, নতুন পল্টনী থানা সুলতান, মিরপুর, ঢাকা
১১৫	মুহাম্মাদ আমিনুর রহমান খান	৯০/জি, আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টার, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
১১৬	মরহুম আইয়ুব হোসেন	৯০/জি, আজিমপুর সরকারি কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১১৭	আলহাজ মুফাজ্জল হুসাইন ভূইয়া	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১১৮	হাজিয়াহ হায়াতুন নেসা	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১১৯	মুহাম্মাদ হামিদ জমাদ্দার	৬৯/৫ বি, সচিব নিবাস, ইন্সটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭
১২০	আলহাজ মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান	২৮/৩, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১২১	মুহাম্মাদ তাফহীমুল ইসলাম	২৮/৩, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১২২	মুহাম্মাদ মনিরুজ্জামান	বিল্ডিং-১২ ফ্ল্যাট-৪ডি, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১২৩	মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান	জয় নগর সরকারি কর্মকর্তা এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, মিরপুর-১৫, ঢাকা-১২১৬
১২৪	মুহাম্মাদ আবরার	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
১২৫	আলহাজ মাহমুদুল হক	মনু বেপারীর ঢাল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১২৬	মরহুম ঈমান উদ্দিন বিশ্বাস	৬/১২, ব্রুক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১২৭	মরহুমা রোকেয়া বেগম	৬/১২, ব্রুক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১২৮	মারজান মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১২৯	মারজিয়া মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩০	হুমাইরা মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩১	জনাব মুহাম্মাদ মজিবুর রহমান	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩২	শামীমা আক্তার	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৩	রাবেয়া খাতুন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৪	জনাব সুলতান মিয়া	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৫	মরহুম নবী হোসেন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৬	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম	(৮/০ ফটজুল আজিম) মুক্তার বাড়ি, উত্তর চাট্টীপুর, ফেনী
১৩৭	জনাব তানিয়া ইসলাম	৬/১২, ব্রুক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১৩৮	মুহাম্মাদ নাবীল ইসলাম	বাসা- ১০৫, রোড- ৪, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৯	মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আহমাদ	১৬ মিডালী রোড, ঝিগাতলা, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা
১৪০	মুহাম্মাদ মাসুম পারভেজ জিতু	৮২/৪/ডি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৪১	জনাব তোবারক হোসেন	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৪২	হাফেয কুরী ফয়সাল বিন মুজিব	ফ্ল্যাট- বি/৩, বাড়ি- ১৫, রোড- ৮, ব্রুক- সি, আবদুল রিজা, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৪৮

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১৪৩	এ্যাড. মাহিনুর রহমান	ফ্লাট-১০০৪, ইস্টার্ন প্যানেলরোড, ৩/২ তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
১৪৪	জনাব সাহীদ পারভেজ	বাড়ি- ২, রোড- ৬, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৫	মরহুমা মাহমুদা খাতুন	মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৬	মরহুম সাফওয়ান আহমাদ	৫৪ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা
১৪৭	ড. মুহাম্মাদ জাহেদুল ইসলাম	২১ কামিনী ভবন, আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা
১৪৮	মনোয়ার এন্টারপ্রাইজ	(৮/০ মাওলানা মাসউদুর রহমান) ৪০/কে দিল্লী রোড, নিউ ইক্সটেন, মগবাজার, ঢাকা
১৪৯	মাওলানা মোকাররম হোসাইন খান	৪০/ডি দিল্লী রোড, নিউ ইক্সটেন, মগবাজার, ঢাকা
১৫০	জনাব আহসান হাবীব	ফ্লাট-৩/এফ, বাড়ি-২৩, রোড-৬, ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা
১৫১	আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম	৫৬/এ ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫২	মিসেস তাহেরা পারভিন	৫৬/এ ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫৩	মুহাম্মাদ জাবিরুল ইসলাম	৫৬/এ ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫৪	হাজী মুহাম্মাদ মোমিন মিয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৫৫	মিসেস হাবীবা বেগম	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৫৬	মারইয়াম ইসলাম	'আবাহন কিশতী' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫৭	মু'আজ ইবনে আশরাফ	'আবাহন কিশতী' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫৮	মুহাম্মাদ ইবনে আশরাফ	'আবাহন কিশতী' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫৯	আরওয়া বিনতে আশরাফ	'আবাহন কিশতী' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬০	মুহিউদ্দীন মাহমুদ সোহেল	'আবাহন নিবস্তী' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬১	মইনুল হক জয়	৮২/৪/ডি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৬২	নিগহাত সুলতানা	১২/১, পি.সি. ব্যানার্জী লেন, সিংটোলা, ঢাকা-১১০০
১৬৩	আবদুস সালাম মিয়া	৩৯ সুবল দাস রোড, চৌধুরী বাজার, লালবাগ, ঢাকা
১৬৪	মুহাম্মাদ আবুল হাশেম	ওরিয়েন্টাল ভারভেইন, ফ্ল্যাট- ডি ৪, ৭০/১ জিগাতলা, ঢাকা
১৬৫	জনাব ইরফান আহনাফ	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
১৬৬	কানিজ হাসিনা	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
১৬৭	মুফতি ফয়জুল্লাহ	পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা
১৬৮	আহনাফ শাহরিয়ার	ফ্লাট-১৫ জে, কনকর্ড এস্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
১৬৯	আলমাকসুমী	১২/১, পি.সি. ব্যানার্জী লেন, সিংটোলা, ঢাকা-১১০০
১৭০	মুহতারামা ফৌজিয়া ফেরদৌস	'রেডউড' বাড়ি- ৮৭, রোড- ২৫/এ, ব্রক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১৭১	মুহতারামা আয়শা রহমান	৬/১২, ব্রক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১৭২	জনাব মুহাম্মাদ কাশিম নূর নকীব	৬/১২, ব্রক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
১৭৩	জনাব মুহাম্মাদ মাহতাব	৩ নিউ পল্টন, চা লাইন, আজিমপুর, ঢাকা
১৭৪	জনাব মুহাম্মাদ ফারহান ফাহিম	১১/এ আজিমপুর টাওয়ার, লালবাগ, ঢাকা
১৭৫	মরহুম আসাদুজ্জামান	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা'র

সম্মানিত স্থায়ী সদস্যবৃন্দের নাম

(যারা এককালীন বা কিস্তিতে একলক্ষ টাকা প্রদান করে সদস্য হয়েছেন)

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	জনাব মুহাম্মাদ সিফাতুল্লাহ	কলমারচর, বেউতা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০২	মাওলানা শামসুল ইসলাম	রোড-৩, বাড়ি-২৫, হিরাকিল আ/এ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
০৩	আলহাজ্ব শাহজাহান কবীর	মুতাওয়াদ্দী, আল-মদীনা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফ্ল্যাট-১০০১, বিল্ডিং- ফুজি-২৩, জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
০৪	জনাব মুহাম্মাদ ফায়েজুর রহমান বিশ্বাস	৬/১২, ব্রক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
০৫	জনাব নূর আহমদ	৪৬/৬/এ জি-৩ নতুন রাস্তার মোড়, বিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
০৬	জনাব ফয়জুর রহমান	১০/২ কাজীমুদ্দীন, বাবু বাজার, ঢাকা
০৭	জনাব হাসিনা খাতুন	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
০৮	জনাব মুহাম্মাদ কামরুল হাসান	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা
০৯	জনাব এ.এস.এম হুমায়ূন কবীর	নয়নতারা-১, ২ রোড- ৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
১০	রূপালী লেইছ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.	৭৫ মনিটোলা, বংশাল, ঢাকা
১১	আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আব্দুর রব	১৫ নং বাড়ী, জাপান গার্ডেন সিটি, আদাবর, ঢাকা
১২	জনাব গোলাম মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩	আলহাজ্ব আতাউর রহমান	৪০/কে দিল্লী রোড, নিউ ইক্সটেন, মগবাজার, ঢাকা
১৪	মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম	'আবাহন কিশতী' বাড়ি-৬, রোড-৫, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৫	মরহুম আলী হুসাইন	(প্রথমে মুশফিকুস সাঈদীন) ৩১৩ দক্ষিণ পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৬	নূরজাহান বেগম	(প্রথমে বদরুজ্জামান) কৃষ্ণচূড়া, ৬/৪/এ, শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা
১৭	জনাব এ. কে. এম. মাকসুদুল হক	আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
১৮	মুহতারামা কানিজ হাসিনা	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
১৯	মুহতারামা সাঈদা কবির	৮/৩/বি, ব্রক-এফ, জয়েন কোয়ার্টার, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০	জনাব ইকবাল আহমাদ	ক্রিহাম, ইংল্যান্ড
২১	আবাহন ডেভেলপমেন্ট লি.	এন/১৪, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
২২	জনাব আজীম কাদরী	ফ্ল্যাট-৩/বি, সান্দ্রনা এপার্টমেন্ট-১, ৬৩/এ, পিলখানা রোড, আজিমপুর, ঢাকা
২৩	আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক	রোড-৩, বাড়ি-২৫, হিরাকিল আ/এ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
২৪	মাওলানা কামরুল হাসান	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
২৫	মরহুমা মনোয়ারা বেগম	এন/১৪, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
২৬	মরহুম আমিন মিয়া	এন/১৪, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
২৭	হাজী আব্দুস সাত্তার	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
২৮	ডাক্তার ইকবাল আহমাদ	বাসা-১৩, রোড-১৫, খান এপার্টমেন্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
২৯	জনাব তাসরীক আহমাদ	ডাক্তার গলি, মগবাজার, ঢাকা
৩০	জনাব জাহের উদ্দিন সরকার	বাড়ি-৩০৫, রোড-২১, মহাখালী ডি.ও.এইচ.এস, ঢাকা
৩১	সোনিয়া আরিফ	বাসা-২৭, রোড-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
৩২	শাহানারা দিলশাদ ছন্দা	হাটির পাড়, কুড়িগ্রাম
৩৩	শেখ মোহাম্মদ আকরাম সাদ্দিদ	১৭ নং বাড়ী, ফ্লাট-৫০১ জাপান গার্ডেন সিটি, আদাবর, ঢাকা
৩৪	জনাব ওয়ালিউল্লাহ রাব্বিল	২১ নং বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩৫	আলহাজ ইদ্রিস আলী মোল্লা	বিভিৎ-০২ ফ্লাট-২০৬ জাপান গার্ডেন সিটি, আদাবর, ঢাকা
৩৬	মুহাম্মাদ শেহজাদ আলম	বাসা-১৩, রোড-৯/এ, ফ্লাট-ই/২ ধানমন্ডি, ঢাকা
৩৭	জনাব নেহাল শিকদার	বাড়ি-৩০, রোড-১১১, গুলশান, ঢাকা
৩৮	মাওলানা মাসউদুর রহমান	৪০/কে দিল্লি রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
৩৯	জনাব ওবায়দুর রহমান (ওসামা)	৪০/কে দিল্লি রোড, নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
৪০	জনাব আবু মুহাম্মাদ রিয়াদ	২৮/২ বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৪১	জনাব ঈমানউদ্দীন বিশ্বাস	৬/১২, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা
৪২	মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান জীবন	ফ্লাট-১০০১, বিজিৎ- ফুজি-২৩, জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৪৩	মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান	ফ্লাট-১০০১, বিজিৎ- ফুজি-২৩, জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৪৪	মুহাম্মাদ মুঈনুল হাসান ইমন	ফ্লাট-১০০১, বিজিৎ- ফুজি-২৩, জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৪৫	জনাব খবীরুদ্দীন জোয়াদ্দার	ফ্লাট-৪০১, বাড়ি- (২০০১) ১২-১৩, পিসি কলচার হাউজিং, ব্লক- ক, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
৪৬	জনাব মাসুম পারভেজ জিতু	৮২/৪/ডি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৪৭	মুহতারামা ফৌজিয়া ফেরদৌস	'রেডউড' বাড়ি- ৮৭, রোড- ২৫/এ, ব্রক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
৪৮	জনাব আসাদুজ্জামান	২২ নর্থ মুগদা, ঢাকা
৪৯	জনাব ফিরোজ মাহমুদ স্বপন	'আবাহন নিকর্গ' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্লক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
৫০	জনাব মুফতী ইবরাহীম হাসান	বাইতুল মুয়াযযম মসজিদ কোয়ার্টার, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর
৫১	জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গির আলম	তরপুরচকী, বাবুরহাট, চাঁদপুর
৫২	মুহতারামা লায়লা নূর	তরপুরচকী, বাবুরহাট, চাঁদপুর
৫৩	মুহতারামা উম্মে ফাযিলা খাতুন	বাসা-বি/৩, বিভিৎ-১৫, আজিমপুর সরকারি কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
৫৪	জনাব আলহাজ আব্দুল হাই	১৫০ আজিমপুর রোড, ঢাকা
৫৫	জনাব জাফরুল্লাহ	বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৫৬	জনাব সাইদুল ইসলাম বিদ্যুত	বাসা-২৫, রোড-০৩, হিরাবিল আ/এ, নারায়ণগঞ্জ
৫৭	মেহেদী হাসান	ভূমিপন্থী আবাসিক এলাকা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৫৮	হাসিনা আজিজুল হক কওমী মাদরাসা	প্লট-০২ রোড-০৮ ব্লক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
৫৯	এ. এস. এম. আব্দুল মান্নান	নিউ ইফটন, মগবাজার, ঢাকা
৬০	জনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান	ফ্লাট-১৫ জে, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
৬১	জনাব জহিরুল হক ভুঁইয়া	ফ্লাট-বি-২ বাড়ি-১১৫, সড়ক-৯/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা
৬২	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
৬৩	জনাব আব্দুল মান্নান	সদরঘাট, ঢাকা
৬৪	আরিফা পারভিন খান	৮৫/আই আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫

বাতায়ন একাদশ সংকলন, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪

১৫১

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৬৫	জনাব আলহাজ্ব হাসিনা বেগম	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
৬৬	জনাব আলহাজ্ব এহসানুল হাবীব	তেজগাঁও, ঢাকা

এছাড়া আরো কিছু সদস্য আংশিক টাকা প্রদান করেছেন, পরবর্তীতে আমরা তাদের নাম প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ। আরও যারা এককালীন কিংবা কিস্তিতে সর্বনিম্ন একলক্ষ টাকা প্রদান করে মা'হাদের স্থায়ী সদস্য হতে ইচ্ছুক তারা ফরম সংগ্রহ করে আবেদন করতে পারেন।

মা'হাদুল বুল্‌সিল ইসলামিয়া ঢাকা'র

সম্মানিত বরকত পরশিত ৩১৩ আজীবন সদস্যবৃন্দের নাম

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	জনাব রাজিউল ওয়াদুদ	রাসূলবাগ, আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা
০২	মুহাম্মাদ সালামতুল্লাহ	বিল মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা
০৩	মুহাম্মাদ মূসা কালিমুল্লাহ	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৪	জনাব মিসওয়াদ ইসলাম (হামিম)	ব্রাহ্মণকিত্তা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৫	সুমায়া হোসেন	৫৪ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
০৬	জনাব তাফাজ্জল হুসাইন (হুয়াইফা)	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৭	হাজিয়ান শামীম আরা বেগম	মনু বেপারীর ঢাল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৮	নূর নাহার রুমী	আউচপাড়া, মোক্তার বাড়ী রোড, সেবা-১২৬, টঙ্গী, গাজীপুর
০৯	মুহাম্মাদ আবু জাফর	মুল্লিপাড়া, সাইলো রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১০	মুহতারামা নাজমা বেগম	১৭/৫ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক, ঢাকা
১১	মরহুম হাজী আনিসুর রহমান	১৭/৫ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক, ঢাকা
১২	এ.এইচ.এম. আমিনুল ইসলাম	৩১ তোপখানা রোড, ঢাকা
১৩	মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক	রোড- ২, প্লট- ৫, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
১৪	মুহাম্মাদ মুয়াজ ইবনে আমীন	৫ আহমদিয়া স্কুল রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা সিটি, খুলনা
১৫	এ.কে.এম. মানজুরুল হক	রূপায়ন এলিট, বাড়ি-৭৩, ব্লক-বি, রোড-৪, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান-১, ঢাকা
১৬	মরহুম আব্দুস সাত্তার গাজী	৮৪/এইচ, বুদ্ধিজীবী রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
১৭	জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
১৮	মরহুম হাজী সিরাজুল ইসলাম	বাড়ি-১৯, রোড- ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৯	হাজিয়ান মানজুমা খাতুন	বাড়ি-১৯, রোড- ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা
২০	শেখ মুহাম্মাদ আলমগীর	৮৯/বি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
২১	শাহ মুহাম্মাদ ফিরোজ আল-ফেরদৌস	৬৩/ডি, আজিমপুর সরকারি অফিসার কোয়ার্টার, ঢাকা
২২	জনাব মুজিবুর রহমান	নাহার মঞ্জিল, ২/২ নর্থ-সাউথ রোড, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
২৩	জনাব শফিকুল ইসলাম	রোড- ১, ওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা
২৪	মাওলানা রফীকুল্লাহ আল-মাদানী	স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
২৫	জনাব আবুল কাশেম জুয়েল	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
২৬	ফাতেমা নাসিম	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
২৭	জনাব আইয়ুব আলী	বাড়ি- ১, রোড- ৪, সূচনা মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

১৫২

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
২৮	আহমাদ আরহাম হুসাইন	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
২৯	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম	বসিলা, ওয়েস্ট ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, ঢাকা
৩০	জনাব আবু আইয়ুব আনসারী	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩১	জনাব নেহাল শিকদার	বাড়ি-৩০, রোড-১১১, গুলশান, ঢাকা
৩২	মিসেস শিরিন সিদ্দিকী	বাসা-২, রোড-৫/বি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩৩	মুহাম্মাদ রোমান হাসান	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩৪	মুহাম্মাদ শাফাআত হুসাইন	উত্তরকুল, বানারীপাড়া, বরিশাল
৩৫	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী	আগদেউলী, এলাশীন, টাঙ্গাইল
৩৬	মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন	২৩/১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩৭	মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান	বাঘরা, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
৩৮	মুহাম্মাদ সেলিম খান	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৩৯	মাওলানা শাকীর আহমাদ	৫০/৪ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪০	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৪/৪ বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪১	মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিক	জিঞ্জিরা নামাবাড়ী, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
৪২	মুহতারামা সিরাজুম মুনীরা	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৩	মরহুম ওয়াজেদ আলী খান	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৪	মুসাম্মাৎ হাসীনা বানু	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৫	মুহাম্মাদ খবীরুদ্দীন জোয়ার্দার	ফ্লাট-৪০১, বাড়ি- (অরবিট) ১২-১৩, পিসি কলচার হাউজিং, ব্রক- ক, শামলী, ঢাকা
৪৬	মুহাম্মাদ রিয়াজুদ্দীন মোল্লা	মীর হাজীবাগ, নবীনগর গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৪৭	এ.এস.এম. আবু জাফর বিশ্বাস	৮৬/জি, আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা
৪৮	মরহুম আয়নাল হক	১/২, ব্রক- বি, মুহাম্মাদপুর ফিউচার টাউন লি., মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৯	মরহুম শামসুল হক মিয়া	১৩/১৭/বি, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৫০	মরহুম মিয়া হোসেন	৭০/ডি, আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
৫১	মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিক	বাসা- ০৭, রোড- ০৯, বসিলা ওয়েস্ট ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৫২	মুহাম্মাদ আমীনুল হক	১২৪/১২/৬, রোড- ০৪, ব্রক- এ, বসিলা ওয়েস্ট ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, ঢাকা
৫৩	হাজী মুহাম্মাদ মোমিন মিয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৪	মিসেস হাবীবা বেগম	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৫	আয়েশা খাতুন	৬৮/১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৬	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	প্লট-৪, রোড-২, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৭	নাজির হোসেন	৯৫/১, গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯
৫৮	মোসাম্মাত ফরীদা বেগম	১৪/সি/৬, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, আজিমপুর, ঢাকা
৫৯	মুহাম্মাদ ফিরোজ আহমাদ সিদ্দিকী	ফ্লাট-৯/ই, ১৩/১, রোড-২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬০	জান্নাতুর ফরিদাউস মিতা	বাড়ি-১, রোড-১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬১	মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান	৭/৩, দয়াল হাউজিং, রোড-১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬২	মাওলানা রশীদ আহমাদ	ফরিদপুর, শশীয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।
৬৩	আলহাজ্ব মুমিনুল্লাহ	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৪	মোসাম্মাত আয়েশা আক্তার	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৫	হাজী মামুনুর রহমান	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭

বাতায়ন একাদশ সংকলন, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪

১৫৩

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৬৬	ফারহান আহমেদ অ্যানি	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৭	মুশফিরা রহমান আরিবা	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৮	মুহাম্মাদ উবাইদুল হক মুকুল	সলমাসির বাহেরচর, শ্যামলাপুর, সাভার, ঢাকা
৬৯	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	উত্তর কামারপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
৭০	ডা. মোস্তফা কামাল	৮/৯, ব্রক-ডি, রোড-২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭১	মোসাম্মাত পরী বানু	২১ নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭২	মোসাম্মাত আসিরন বানু	মিরপুর, ঢাকা
৭৩	মুহাম্মাদ শাহরিয়ার কবির	পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর
৭৪	জামাল আহমাদ	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৫	মু'আবিয়া ইবনে আমীন	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৬	আমরিনা আক্তার মায়ী	১/এ/১ উত্তর আদাবর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৭	মারুফুর রহমান	১/এ/১ উত্তর আদাবর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৮	সুমায়া মাহমুদ	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৭৯	আনিসা মাহমুদ হুমাইরা	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৮০	আইমান মাহমুদ	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৮১	মরহুম সবুজ জামাদার	চলিতা বুনিয়া, চমাপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
৮২	মাহির মাহমুদ সরকার	বাড়ি-০৫, রোড-০৪, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৮৩	আব্দুল হাকীম সরকার	বাড়ি-০৫, রোড-০৪, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৮৪	রিয়াজ উল্লাহ	২ নং রূপসী স্ট্যাড রোড, নতুন বাজার, খুলনা
৮৫	শাহজাহান শেখ	১৮ আজিমপুর রোড, আনন্দ ভবন (ই-৭), ঢাকা
৮৬	আতীকুর রহমান	বাসা-২৫, রোড-০২, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৮৭	ইবনে আনোয়ার সাদাত (উজ্জ্বল)	কামারপাড়া, সোনাটলা, বগুড়া।
৮৮	কাজী মুজীবুর রহমান	১৩/৮ ডি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি আবাসন, জোন-বি, আজিমপুর, ঢাকা।
৮৯	ডা. উম্মী রহমান নিপা	১৩/৮ ডি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি আবাসন, জোন-বি, আজিমপুর, ঢাকা।
৯০	মুনীর হোসেন	ফ্লাট-১/এ, বাসা-১৯, রোড-০৩, ধানমন্ডি, ঢাকা
৯১	মাওলানা দলীলুদ্দীন রহ.	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৯২	রিজিয়া বেগম রহ.	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৯৩	আববার মাহমুদ	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
৯৪	নাসীমুল্লাহ	২৮/২ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৯৫	ফিরোজা বেগম	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৯৬	আব্দুর রশীদ	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৯৭	রাবেয়া আক্তার	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৯৮	গোলাম কিবরিয়া	বাড়ি- ৩, রোড- ২, আরাম হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৯৯	আহসানুল্লাহ	ওয়েস্ট ধানমন্ডি, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০০	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ যায়েদ আবু সাঈদ	শান্তিনগর, বরহমগঞ্জ, শিবচর, মাদারীপুর
১০১	আলী আকবর	আরিচপুর, মনুগর, টঙ্গি, গাজীপুর
১০২	নিয়াজ মোর্শেদ	৭৫/সি/৩, শিহর ডিবি রোড, মোমেনশাহী
১০৩	মরহুমা আনোয়ারা বেগম	সুলতান শাহী, গোপালগঞ্জ

১৫৪

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১০৪	ইনআমুল হক জিহাদ	গ্রাম- পাঁচগাঁও, পোস্ট- বাঁশতৈল, থানা- মির্জাপুর, জেলা- টাঙ্গাইল
১০৫	মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন	১১৭ গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা
১০৬	আব্দুর রাফি ইবনে মাহমুদ	বাড়ি-৫, রোড-২, আরাম মডেলটাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০৭	মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ	বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০৮	আলহাজ্জ হারুনুর রশীদ	সূর্য ভিলা, চাঁদ উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০৯	মুহাম্মাদ সাকিবর আহমাদ	বাউচর, শ্যামলাপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১১০	মাকসুদুল আলম রানা	উত্তরপাড়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১১	আনায়্যা মায়ামীন শেজা	প্লট-২২, রোড-২, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১২	মুহাম্মাদ মনিরুদ্দীন	প্লট-২২, রোড-২, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৩	মরহুম এস. এম.সুন্নাত আলী	ফ্ল্যাট-৫০১, বিল্ডিং-১৭, জাপান গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৪	বেগম নাছিমুল্লাহ	ফ্ল্যাট-৫০১, বিল্ডিং-১৭, জাপান গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৫	শেখ আনোয়ার মাসুদ	ফ্ল্যাট-৫০১, বিল্ডিং-১৭, জাপান গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৬	শেখ আলতাফ মাহমুদ	ফ্ল্যাট-৫০১, বিল্ডিং-১৭, জাপান গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৭	শেখ নাজমুস সাকিব	ফ্ল্যাট-৫০১, বিল্ডিং-১৭, জাপান গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৮	আলহাজ্জ আব্দুল মান্নান	বাড়ি-১৪, রোড-১, আরাম মডেলটাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১১৯	রোমানা আফরোজ	ফ্ল্যাট-৫/বি, বাড়ি-৩, রোড-২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২০	মুস্তফা আলী	ফ্ল্যাট-৫/বি, বাড়ি-৩, রোড-২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২১	নুসাইবাহ বিনতে মুস্তফা	ফ্ল্যাট-৫/বি, বাড়ি-৩, রোড-২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২২	আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা	ফ্ল্যাট-৫/বি, বাড়ি-৩, রোড-২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২৩	মুআজ বিন মুস্তফা	ফ্ল্যাট-৫/বি, বাড়ি-৩, রোড-২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেনসিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২৪	মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা	৪১/১-সি, রোড-০৭, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২৫	মোসাম্মাত মহাসিনা বেগম	৪১/১-সি, রোড-০৭, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২৬	মোসাম্মাত আমেনা বেগম ফাতেমা	বাসা-১২, রোড-১২, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১২৭	মোসাম্মাত মায়্যা ইসলাম	৪৩/১ জুরাইন মেডিকেল রোড, ঢাকা
১২৮	মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম	৪৩/১ জুরাইন মেডিকেল রোড, ঢাকা
১২৯	মুহাম্মাদ সাকিবর আহমাদ	বাসা-১২, রোড-১২, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩০	আব্দুর রহীম মিয়া	বাদামতলী, ঢাকা
১৩১	মোসাম্মাত সুরাইয়া বেগম	বাড়ি-১৩, রোড-১, শেখেরটেক, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩২	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	করিম গার্ডেন, ১৮২ ছাতা মসজিদ লেন, পূর্ব রাস্তার বাজার, ঢাকা
১৩৩	মুহাম্মাদ শরাফত আলী	প্রকৌশল বিভাগ, বা.প্র.বি. ঢাকা
১৩৪	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম	১১/এ স্বপ্ননীড় হাউজিং, পশ্চিম বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৫	সিদরাতুল মুনতাহা (মিরা)	১১/এ স্বপ্ননীড় হাউজিং, পশ্চিম বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৬	মুহতারাম আব্দুর রহমান মাস্টার	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৭	মুহতারামা হুনাফা বেগম	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৮	খাদিজাতুল কুবরা রুমী	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৯	ফাতেহ মুহাম্মাদ বিন গাজী	'আবাহন নিকস্টি' বাড়ি-৬, রোড-৯, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪০	মুহাম্মাদ ফয়সাল হোসেন	বাড়ি-২৩, রোড-৩/এফ, সেকটর-৯, উত্তরা, ঢাকা
১৪১	মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান	ভূমিপন্থী আবাসিক এলাকা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

বাতায়ন একাদশ সংকলন, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২৪

১৫৫

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১৪২	মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন	২৭/৬/এ যোগীনগর লেন, ওয়ারী ঢাকা
১৪৩	হাজী মুহাম্মাদ রমিজ উদ্দিন	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৪	মুহাম্মাদ সাইদুল ইসলাম	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৫	মুহাম্মাদ মতিউর রহমান মোল্লা	৮৫/আই আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
১৪৬	শিরিন ইসলাম	সলমাসির বাহেরচর, শ্যামলাপুর, সাভার, ঢাকা
১৪৭	মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ	বাড়ি- ৩, রোড-২, ব্রক সি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৮	মোহাম্মদ সানাউল্লাহ	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৯	মাওলানা আসাদুল্লাহ	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫০	সাকিনা আক্তার	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫১	রাবেয়া নাজনিন নিরা	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫২	জনাব নাফিউল্লাহ আদনান	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫৩	জনাব আহসানুল্লাহ নাহিয়ান	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫৪	জনাব ইউসুফ রহমান	ওয়ারী, ঢাকা
১৫৫	জনাব সাখাওয়াত হুসাইন	চর রমিজ, বিবির হাট, রামগতি, লক্ষীপুর
১৫৬	জনাব মনির হুসাইন	গোবিন্দীয়া, হরীনা, চাঁদপুর
১৫৭	জনাব আশরাফুল আলম	তেজগাঁও, ঢাকা
১৫৮	জনাব সাইফুল ইসলাম	বনগ্রী, ঢাকা
১৫৯	জনাব সদর আলী ফকীর ও বনা বিবি	বাড়ি-১৪, রোড-১, আরাম মডেলটাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬০	জনাব আব্দুল কাদের	পূর্ব চর নেয়ামত, রামদয়াল বাজার, রামগতি, লক্ষীপুর
১৬১	জনাব মুহাম্মাদ বিন ইমরান (বাদল)	১/১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬২	জনাব মুহাম্মাদ রাজিব হোসেন	১/১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৩	জনাব মুহাম্মাদ ইয়ার হোসেন	বসিলা, ওয়েস্ট ধানমন্ডি হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৪	জনাব মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন	আরাম হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৫	জনাব মাজিদুল হক নয়ন	আরাম হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৬	জনাব তুহা ইসলাম	২১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৭	জনাব হাজী উসমান গণী	ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৬৮	জনাব মুহাম্মাদ আবুল হোসেন	বসিলা ওয়েস্ট ধানমণ্ডি হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৬৯	জনাব মুহাম্মাদ হামিম মুন্সি	বাসা-৪ বি, রোড-০৩, শামলী হাউজিং, নবাবদ হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭০	জনাব মুহাম্মাদ সফওয়ান আবরার	১১/১ স্বপ্ননীড় হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭১	জনাব মুহাম্মাদ তসলিম উদ্দিন	বাড়ি-২৮০, রোড-০২, মুহাম্মাদী হাউজিং সোসাইটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭২	জনাব মুহাম্মাদ মনজুরুল হাসান	রোড-০১, প্লট-০২, ফিউচার টাউন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭৩	জনাব ফারুক ইসলাম	১ নং বসিলা গার্ডেন সিটি অফিস, ঢাকা
১৭৪	জনাব মুহাম্মাদ শাওন ইসলাম	রোড-০৬, ব্রক-সি, বাড়ি-১৬, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭৫	মুহতারামা মোসাম্মাত উম্মে মুসাইদ	উত্তর কামারগাঁও, আলামিন বাজার, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
১৭৬	জনাব মিজান	রোড-০৬, ব্রক-সি, বাড়ি-১৬, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭৭	জনাব রেজাউল হোসেন	বাড়ি-০৩, রোড-০২, ব্রক-সি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭৮	জনাব সাহাবুদ্দীন	বাড়ি-০১, রোড-১৫, ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৭৯	জনাব আলহাজ্জ রিয়াজুল ইসলাম	ব্রাহ্মণকিত্তা, কালিন্দি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

১৫৬

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১৮০	জনাব আব্দুল আউয়াল হাওলাদার	বসিলা ওয়েস্ট ধানমণ্ডি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৮১	মুহতারামা মোসাম্মাত আকলিমা আহমাদ	বাসা-১৯, ব্রক-বি, ৪০ ফিট অ্যাভিনিউ রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৮২	জনাব সৈয়দ ইউসনুস আলী	পুরুলিয়া, আড়িয়ারা, লোহাগড়া, নড়াইল
১৮৩	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মামুন	আবাহন রিশতা, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৮৪	জনাব মুহাম্মাদ আবু রাইহান	পূর্ব শারভুবি, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট
১৮৫	জনাব মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমান	কালমা, লালমোহন, ভোলা
১৮৬	মুহতারামা আমাতুল্লাহ ইরহা হুসাইন	২২ ভদ্রাবাগ, শেরেবাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা
১৮৭	জনাব মেহেদী হাসান	
১৮৮	জনাব মুহাম্মাদ ইসমাইল হুসাইন জীবন	বাসা-০৯, রোড-০১, ব্রক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৮৯	জনাব মাওলানা কবীর হুসাইন	মুমিনপুর, চাঁদপুর
১৯০	জনাব সাইদুল ইসলাম বিদ্যুত	বাসা-২৫, রোড-০৩, হিরাবিল আ/এ, নারায়ণগঞ্জ
১৯১	মুহতারামা তাশফিয়া রহমান	৪০/কে দিল্লি রোড, মগবাজার, ঢাকা
১৯২	জনাব সাইদুল ইসলাম	দিল্লি রোড, মগবাজার, ঢাকা
১৯৩	মরহুম হাজী আব্দুল লতিফ মাস্টার	বাসা-১৩, রোড-০৫, ব্রক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৯৪	মুহতারামা মালেকা পারভীন	বাসা-১৩, রোড-০৫, ব্রক-এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৯৫	জনাব আজমত হুসাইন	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৯৬	জনাব প্রফেসর সালাহ উদ্দিন	কুমিল্লা
১৯৭	জনাব সাখাওয়াত হুসাইন	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৯৮	মুহতারামা ফরিদা খাতুন	
১৯৯	জনাব নিহাল ইসলাম	বাসা- ১০৫, রোড- ৪, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০০	জনাব মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান	১৫/৫ সি, মেট্রো হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০১	জনাব আমির হুসাইন	রায়েরচর, কেরানীগঞ্জ
২০২	মুহতারাম উসমান	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০৩	মুহতারামা হুমায়রা	২১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০৪	মাওলানা আখতার হুসাইন	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০৫	জনাব খলীলুর রহমান	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২০৬	হাফেয মুহাম্মাদুল্লাহ রহ.	১৯/৩ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা

মা'হাদের লিল্লাহ বোর্ডিং ও সাধারণ ফান্ডে দান করার ঠিকানা

MAHADUL BUHUSIL ISLAMIA

A/C No: 0831020002658 (General Fund)

0831220000197 (Lillah Fund)

Al-Arafah Islami Bank Ltd.

Branch: Atibazar, Keraniganj

মা'হাদের নির্মাণ ফান্ডে দান করার ঠিকানা

AL-MADINA JAME MASJID COMPLEX

A/C No: 0371020023065

Al-Arafah Islami Bank Ltd.

Branch: Muhammdpur Krishi Market

অডিটর

জনাব কামরুল হাসান, এফ.সি.এ

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া। মোবা : ০১৭১১৮৯২১০৫

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা

থেকে ১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ইফতা কোর্স সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১ মুহাম্মাদ শুয়াইব আহমাদ পিতা: জনাব আব্দুল করিম গ্রাম: উলুকান্দা, পোস্ট: উত্তর জগদীশপুর থানা: মোহনগঞ্জ, জেলা: নেত্রকোণা ০১৭৩৪৬৭৬৭০৯	২ মুহাম্মাদ আলী হুসাইন পিতা: জনাব শফিকুর রহমান গ্রাম: ছুপুয়া দক্ষিণ পাড়া, পোস্ট: মাহিনী বাজার থানা: নাজুলকোট, জেলা: কুমিল্লা ০১৬৯০০৮৪৮৭৬
৩ মুহাম্মাদ হাদিউল ইসলাম পিতা: জনাব গোলাম মোস্তফা গ্রাম: রায়মনি, পোস্ট: রায়মনি থানা: ত্রিশাল, জেলা: মোমেনশাহী ০১৯৮৫৯৪১২৮৩	৪ মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম পিতা: জনাব ফজলুল হক গ্রাম: ঘাটের কোণা, পোস্ট: বীর আহমাদপুর থানা: গৌরিপুর, জেলা: মোমেনশাহী ০১৭৩৪৬৭৬৭০৯
৫ মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ পিতা: মাওলানা আব্দুল কাদের গ্রাম: কামারজুরী, পোস্ট: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর ০১৭১৬৭৮৮১৫৪	৬ মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম শাব্বির পিতা: হাফেয আব্দুর রব গ্রাম: পশ্চিম বাশড়া পোস্ট+থানা+জেলা: মানিকগঞ্জ ০১৭৩৮৪২৪৫৭৫
৭	৮

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন
পিতা: মাওলানা আবুল হাসান দা.বা.
গ্রাম+পোস্ট: জয়রামপুর
থানা: দামুড়হুদা, জেলা: চুয়াডাঙ্গা
০১৬৪৬৩০৮৯২৩

মুহাম্মাদ মানসুরুল হক
পিতা: মুফতী মামুনুর রশীদ
গ্রাম: কার্তিকপুর, পোস্ট: জয়পাড়া
থানা: দোহার, জেলা: ঢাকা
০১৯৮৬৪৪৪৩২৮

৯
মুহাম্মাদ আবু যায়েদ
পিতা: জনাব শফী উদ্দীন
গ্রাম: মাছিমপুর, পোস্ট: চালাকচর
থানা: মনোহরদী, জেলা: নরসিংদী
০১৬৪৮৮৪৫৬৯৯

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ইফতা কোর্স সম্পন্ন করলেন
[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১
মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন
পিতা: ক্বারী মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
গ্রাম: জীবনপুর, পোস্ট: ধনিস্বর
থানা: বরুড়া, জেলা: কুমিল্লা।
০১৮৮৯৪৭৬৭০৫

২
মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ (শাকিল)
পিতা: মুহাম্মাদ হুমীর উদ্দিন
গ্রাম: ঢাকী, পোস্ট: ঢাকী
থানা: মিঠামইন, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০১৯৩৬৮৩৮৫৮৭

৩
মুহাম্মাদ তানভীর আহমাদ
পিতা: মুহাম্মাদ তাসলীম উদ্দিন
গ্রাম: চহুতপুর, পোস্ট: কাশিপুর
থানা: বিমানবন্দর, জেলা: বরিশাল
০১৮৮৫২৮৯৯৫১

৪
সৈয়দ কামারুজ্জামান নাজির
পিতা: সৈয়দ ফরিদ আহমদ
গ্রাম: সৈয়দপুর, পোস্ট: সৈয়দপুর-৩০৬১
থানা: জগন্নাথপুর, জেলা: সুনামগঞ্জ
০১৭৯৫৮৫৯৯০৬

৫
মুহাম্মাদ হিলালুদ্দীন
পিতা: মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান
গ্রাম: কন্দর্পপুর, পোস্ট: বড়েকা
থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর
০১৯৩৮৬২৬৮১৫

৬
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান
পিতা: হা. মাও. জহুরুল ইসলাম
গ্রাম: জোড়খালী, পোস্ট: গোসাইবাড়ী
থানা: ধুনট, জেলা: বগুড়া
০১৬০৮৭৫২৭৯৮

৭

৮

মুহাম্মাদ শামীম হুসাইন (মনির)
পিতা: মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ
গ্রাম: ভেবলা, পোস্ট: কাষ্টশিংগা
থানা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর
০১৯৩৫৭৯৯৭৭১

মুহাম্মাদ মাহদী হাসান তুলহা
পিতা: হাজী কামাল আহমাদ
গ্রাম: উত্তর দিঘলী, পোস্ট: দিঘলী
থানা: লৌহজং, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
০১৬৩৩৬৩০৯২৬

৯
মুহাম্মাদ তকী আব্দুল্লাহ
পিতা: হা. ক্বারী মুহাম্মাদ মাহফুজুল হক
গ্রাম: গাজীবাড়ী, পোস্ট: বাসুদেবাড়ী
থানা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
০১৭৪২৮৭২৮০৩

১০
মুহাম্মাদ জুনাইদ আহমাদ নাদিম
পিতা: হা. মাও. শাকীর আহমাদ শিবলী
গ্রাম: কৃষ্ণপুরা, পোস্ট: উদ্বগঞ্জ
থানা: সোনারগাঁ পৌরসভা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
০১৮৮২-৯৭২২১০

১৪৪৪-৪৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ইফতা কোর্স সম্পন্ন করলেন
[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১
মুহাম্মাদ সামিউল হক
পিতা: জনাব মো. খোরশেদ আলম
গ্রাম: বয়ড়া, পোস্ট: বা কৃ বি
থানা: কোতুয়ালী, জেলা: মোমেনশাহী
০১৩০৩৪৭০৪৫৮

২
মুহাম্মাদ সিফাতুল্লাহ
পিতা: হাফেয মুহাম্মাদ শওকত শেখ
গ্রাম: গাংনী, পোস্ট: পাকগাংনী
থানা: মোল্লাহাট, জেলা: বাগেরহাট
০১৭৫২৪৪২২১৬

৩
মুহাম্মাদ ইহসানুদ্দীন
পিতা: হাফেয আবুল হাশেম
গ্রাম: বাহেরপাড়া, পোস্ট: সোনাপুর
থানা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী
০১৭৬৫৭৬২৮৩০

৪
মুহাম্মাদ সিয়াম আহমাদ
পিতা: জনাব লুকমান হুসাইন
গ্রাম: নান্দিনা নয়াপাড়া, পোস্ট: নান্দিনা
থানা: জামালপুর, জেলা: জামালপুর
০১৯১৬১৭১০৪৪

৫
মুহাম্মাদ ইনআমুল হাসান
পিতা: মুহাম্মাদ সুলতান সাহেব
গ্রাম: শ্রী বাড়ি, পোস্ট: বড়টিয়া
থানা: ঘিওর, জেলা: মানিকগঞ্জ
০১৬২১৮২৯৫০৭

৬
মুহাম্মাদ উমর ফারুক
পিতা: মরহুম আব্দুস সামাদ
গ্রাম: আমিরপাড়া, পোস্ট: কালিগঞ্জ
থানা: বিবিগঞ্জ, জেলা: পঞ্চগড়
০১৯৪৮২৭৪৬৭৫

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া ঢাকা

১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম পিতা: জনাব মাসউদুর রহমান গ্রাম: লেজ সাকিনা, পোস্ট: ডাউরি বাজার থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা ০১৭৪৮৫৭২৬৯১	২ মুহাম্মাদ তাফহীমুর রহমান পিতা: হাফেয জিয়াউর রহমান বসিলা, মুহাম্মাদপুর ঢাকা ০১৮১৬৪০২০৭৬
--	---

৩ মুহাম্মাদ উমর ফারুক পিতা: জনাব বাবুল শেখ গ্রাম: শিকদার কান্দি, পোস্ট: বুদের হাট থানা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর ০১৯২২৫৩১০৭৭	৪ মুহাম্মাদ তাহসীন আহমাদ পিতা: জনাব আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা গ্রাম: বসিলা, পোস্ট: মুহাম্মাদপুর থানা: মুহাম্মাদপুর, জেলা: ঢাকা ০১৭১৬০৫০০৪৪
---	--

৫ মুহাম্মাদ বাইয়্যীদ রহমান পিতা: জনাব শওকাতুর রহমান গ্রাম: কাশিমনগর, পোস্ট: কাশিমনগর থানা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর ০১৮১৯২১৪৩৭৫	৬ মুহাম্মাদ তাশফিন আহমাদ সাদ পিতা: মাওলানা শাহাদাত হুসাইন গ্রাম: জয়নগর, পোস্ট: আটি বাজার থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা ০১৮১৯৯০২০৪০
---	--

৭ মুহাম্মাদ বখতিয়ার উদ্দীন পিতা: জনাব নজরুল ইসলাম গ্রাম: ফাসিয়া তলা, পোস্ট: ফাসিয়া তলা থানা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর ০১৭৪০৯১৫৭৩০	৮ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ সিয়াম পিতা: জনাব নূরুল আমীন গ্রাম: মির্জারচর, পোস্ট: মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, থানা: শিবচর, জেলা: মাদারীপুর ০১৭৪৮১৮৩৪৩০
--	--

৯ মুহাম্মাদ আবু বকর সালামান পিতা: মাওলানা আব্দুর রশীদ আহমাদ গ্রাম: মরকাজ ফরিদপুর, পোস্ট: শশিয়া বাজার, থানা: বরগুড়া, জেলা: কুমিল্লা ০১৭১২০০৯৫৫৩
--

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১ মুহাম্মাদ মুনীর হুসাইন পিতা: জনাব বেলায়েত হুসাইন গ্রাম: নোয়াপুর, পোস্ট: ছুপুয়া থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা ০১৮৭১০৭২৪৬৫	২ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ মুয়ায আরহাম পিতা: জনাব সালাহ উদ্দিন গ্রাম: দেড়াকাটা, পোস্ট: খিরলশান বাজার থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা ০১৯১৭০৬০৫৯৪
--	--

৩ মুহাম্মাদ আমির হামজা পিতা: জনাব মিরাজ শেখ গ্রাম: চরলক্ষ্মীপুর, পোস্ট: গাজনা ব্যাসদী থানা: মধুখালী, জেলা: ফরিদপুর ০১৩১৬৬৫৮২৪৫	৪ মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান পিতা: জনাব টুলু কাজী গ্রাম: জায়গির আরপাড়া, পোস্ট: যুনাশুর থানা: মোকসেদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ ০১৭৬০৮৫৭০০৪
--	---

১৪৪৪-৪৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১ মুহাম্মাদ মারুফ বিল্লাহ পিতা: মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক গ্রাম: মাহাতাবপুর, পোস্ট: গোলাপগঞ্জ থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর ০১৮৮+১৮০৮০৬	২ মুহাম্মাদ মাহীর ফয়সাল আফনান পিতা: মুহাম্মাদ ইকরাম হুসাইন (মানিক) গ্রাম: বসিলা, পোস্ট: মুহাম্মাদপুর থানা: মুহাম্মাদপুর, জেলা: ঢাকা ০১৮৫১৫৭৭২৬৩
---	--

৩ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ যাকওয়ান পিতা: হাফেয নূরুল হক আরমান গ্রাম: কুষ্টিয়া কারারিয়াকান্দা, পোস্ট: বিদ্যাগঞ্জ থানা: কোতয়ালী, জেলা: মোমেনশাহী ০১৭২২৭৫১১৮৩	৪ মুহাম্মাদ তাউফীক এলাহী পিতা: জনাব তাওহীদুর রহমান গ্রাম: চরবিশ্বাস, থানা: গলাচিপা জেলা: পটুয়াখালী ০১৭৭৫৮৬৫৫৪৪
---	---

৫ মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ পিতা: জনাব আবুল কাশেম গ্রাম: ফরিদাবাদ, থানা: হাজিরহাট জেলা: ভোলা ০১৭৪৫৬৮১৮১৭	৬ মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান পিতা: জনাব লুৎফুর রহমান গ্রাম: চৌবেপুর, পোস্ট: কুটি থানা: কসবা, জেলা: বি-বাড়িয়া ০১৯৮৪৮৬২৮৯০
--	--

৭	৮
-----------------	-----------------

মুহাম্মাদ উমাইর
পিতা: মুহাম্মাদ রুবেল
গ্রাম: +পোস্ট: উত্তর বাখরনগর
থানা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
০১৯৪২৯৪২২৮

মুহাম্মাদ ফারহান সাদিক
পিতা: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মোল্লা
গ্রাম: মৌখালী, পোস্ট: গজালিয়া
থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা
০১৯৯২৫০৪৬২২

৯
মুহাম্মাদ সাক্বির আহমাদ
পিতা: জনাব নজরুল ইসলাম
গ্রাম: ঘোড়ামারা, থানা: কমলগঞ্জ
জেলা: মৌলভীবাজার
০১৭৪২৯৭২৬৪৩

১০
মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম
পিতা: মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান কোরবান আলী
গ্রাম: নুরাবাদ, পোস্ট: দুলাহাট
থানা: দুলাহাট, জেলা: ভোলা
০১৮১৮৭৭১৩৩৯

১১
মুহাম্মাদ সাদমান আনওয়ার
পিতা: জনাব আনওয়ার সাদাত দিদার
গ্রাম: শৈলজানী, পোস্ট: কোদালিয়া
থানা: পাকুন্দিয়া, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০১৮১৯২৩২০৪৮

১২
মুহাম্মাদ তউহীদুল ইসলাম
পিতা: মুহাম্মাদ আরাফাত আলী
গ্রাম: কলমারচর, পোস্ট: বেউতা
থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
০১৮৬১৫৩৩০৮২

মা'হাদুল বুহসিল ইসলামিয়া কেরানীগঞ্জ

কলমারচর মধ্যপাড়া (প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন), বেউতা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন
[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১
মুহাম্মাদ মিনহাজ মোল্লা
পিতা: মুহাম্মাদ মানিক মোল্লা
গ্রাম: পাইকদিয়া, পোস্ট: আইকদিয়া
থানা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
০১৭৯৯৪৮৭১৫৫

২
মুহাম্মাদ সিয়াম হুসাইন
পিতা: মুহাম্মাদ বিল্লাহ হোসেন
গ্রাম: চরবউলা, পোস্ট: অস্ত্রিকাগঞ্জ
থানা: কোতালী, জেলা: মোমেনশাহী
০১৯১৮৫৯৭১৬৬

১৪৪৩-৪৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন
[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১

২

মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন
পিতা: মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন
গ্রাম: কলমারচর, পোস্ট: বেউতা
থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
০১৮৫৩৬৮৮৬৯১

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান জামিল
পিতা: মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন
গ্রাম: কলমারচর, পোস্ট: বেউতা
থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
০১৯১০৮২৯১০৮

৩
মুহাম্মাদ হযরত আলী
পিতা: মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন
গ্রাম: কড়কি, পোস্ট: চৌহালী
থানা: চৌহালী, জেলা: সিরাজগঞ্জ
০১৬৩৬৮০৩২০৭

৪
মুহাম্মাদ শাহ আলম
পিতা: মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন
গ্রাম: জোড়াবাড়ী, পোস্ট: মির্জাগঞ্জ
থানা: ডুমুর, জেলা: নিলফামারী
০১৭৯৪৬৬১৪৮১

৫
মুহাম্মাদ মাহদী হাসান
পিতা: মাওলানা আবু ইউসুফ
গ্রাম: গোয়ালপাড়া, পোস্ট: গুরদিয়া বাজার
থানা: সালথা, জেলা: ফরিদপুর
০১৭৬৬৫৬০০৯৩

৬
মুহাম্মাদ সাকিবুল ইসলাম
পিতা: মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
গ্রাম: উত্তর শিয়ালকাঠি, পোস্ট: শিয়ালকাঠি
থানা: ভাণ্ডারিয়া, জেলা: পিরোজপুর
০১৬৭৫৯৭৪৬২১

১৪৪৪-৪৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন
[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১
মুহাম্মাদ আদে রাব্বি
পিতা: মুহাম্মাদ আইয়ুব আলী
গ্রাম: ব্যাসদী, পোস্ট: গাজনা ব্যাসদী
থানা: মধুখালী, জেলা: ফরিদপুর
০১৭৬৬৫৬০০৯৩

২
মুহাম্মাদ রিয়াদ হুসাইন
পিতা: মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক
গ্রাম: ব্যাসদী, পোস্ট: গাজনা ব্যাসদী
থানা: মধুখালী, জেলা: ফরিদপুর
০১৭৬৬৫৬০০৯৩

৩
মুহাম্মাদ মাহদী হাসান
পিতা: মুহাম্মাদ মোরশেদ আলম মোল্লা
গ্রাম: হাটাবো, পোস্ট: মাছুমাবাদ
থানা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
০১৭৫৮৮৫৯৩৪০

৪
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
পিতা: মুহাম্মাদ শফিউদ্দীন
গ্রাম: মাছিমপুর, পোস্ট: চালাকচর
থানা: মনোহরদী, জেলা: নরসিংদী
০১৮৮৮৭৫১৯৯৭

৫

মুহাম্মাদ তামিম ইকবাল
পিতা: মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
গ্রাম: পিপলা, পোস্ট: খুবজীপুর
থানা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর
০১৭৫৮২১৯০২৫